হুইসল্

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নবভারতী

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : : কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৫ সেপ্টেম্বর

প্রকাশক

সুনীল দাশগুপ্ত

নবভারতী

৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর

সন্তোষকুমার ধর

ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট

সুবোধ দাশগুপ্ত

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান

বইঘর

চট্টগ্রাম

দুই টাকা আট আনা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

করকমলেষু

হুইসল্

রতিকান্তর এমন বয়েস নয় যে আবার সে একটা বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু কা'কে কে বোঝায়, রতিকান্ত মচকাবে তবু ভাঙবে না।

সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে যেতেই তার সমস্ত শরীর ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে ওঠে। আবার একটি মেয়ে আসবে, আরেকটি মেয়ে, মাথায় লজ্জা-নোয়ানো আধখানা ঘোমটা, দেহে কামনার অব্যক্ত সম্মতি, সেই আবার মধুর, সুগন্ধ অন্ধকার। সেই আবার পুনঃপুনরুক্ত কথার নির্ভুল আবৃত্তি: তোমার মতো কাউকে আমি আর এত ভালোবাসিনি, এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

ভাবতেই রতিকান্ত সমস্ত শরীরে গলিত একটা অশুচিতা অনুভব করে।

—কিন্তু বিয়ে না করলে সংসার চলবে কি করে রতি? আত্মীয়-বন্ধুরা প্রতিবাদ করে ওঠে: ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে দু'টোরই বা কে দেখা শোনা করবে?

রতিকান্তর ঠোঁটের উপর তীক্ষ্ণ একটা হাসি জ্বলে ওঠে: আর তিনি এলেই যে ওদের কোলে পিঠে করে মানুষ করবেন তার ঠিক কী। দু'দিন যেতে-না-যেতে হয়তো নিজেরই কোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। মানির আর ছনুর জন্যে আমি কিছু ভাবি না। বুড়ি—কেন বুড়িই তো ওদের মা'র মতো।

—কিন্তু বুড়ি তো আর এ-বাড়িতে চিরকাল বসে থাকবে না। তার বিয়ে দিতে হবে তো?

—তেমন মানি-ছনুরাও চিরকাল ছোট হয়ে থাকবে না, ততদিনে তারাও নিজের-নিজেরটা দেখতে-শুনতে শিখবে।

আত্মীয় বন্ধুরা এইটুকুতেই নিরস্ত হয় না; গলাটা খাদে নামিয়ে

বলে : কিন্তু বউ একটা মারা গেল পর এই তোমার বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া স্বভাবটাই কি বিশেষ ভালো দেখাচ্ছে ?

রতিকান্ত অলক্ষ্যে গম্ভীর হয়ে পড়ে : সব জিনিস কি সকলের চোখে সমান ভালো দেখায় ?

—তোমার এই সতীত্বের তো কোনো মানে বুঝতে পারি না, রতিকান্ত। স্ত্রীর স্মৃতির অবমাননা হ'বার ভয়ে তুমি বিয়ে করছ না, এদিকে—

—সব জিনিসের মানেও সকলে সমান বোঝে না। রতিকান্ত মুখের উপর ঘন করে গাম্ভীর্যের পরদা টেনে দেয় : পৃথিবীতে যে লোক রুগ্ন, কুৎসিত, সে-ও ভালোবাসতে পারে। ভালোবাসতে পারে বলেই যে চিরকাল তার আয়ু অক্ষয়, দেহ নিরাময় থাকবে পৃথিবীর আইনে এমন কোনো নিয়ম নেই। প্রয়োজনসাধনের ব্যাপারটার মধ্যে প্রেমের খাদ মেশাতে চাই না।

বাঙলা-দেশের ছোট, পাড়াগেঁয়ে একটি শহর, রেল-লাইনের ধারেই রতিকান্তের বাসা।

বুড়ি সমস্ত দিন সংসারের কাজ-কর্ম করে, আর যখনই বাড়ির পাশ দিয়ে হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেন যায়, হাতের কাজ ফেলে-ছড়িয়ে রেখেই সে এলো-আঁচলে জানলার কাছে ছুটে আসে। দিন-রাত্রির মধ্যে কতবার যে ট্রেন যাওয়া-আসা করে গুনে তা আর শেষ করা যায় না। কোনোটা দাঁড়ায় না, কোনোটা আবার দাঁড়ায়। যখন একবার দাঁড়ায়—

—বুড়ি !

নিশ্চিন্ত হয়ে ঠায় দু' মিনিট দাঁড়িয়ে যদি কিছু তার দেখবার জো আছে।

রতিকান্ত বলে : কল্‌কেটা ঢেলে সাজিয়ে নিয়ে আয় শিগগির। কী সারাক্ষণ ইষ্টিশানের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকিস ?

কল্‌কেটা হাতে করে বুড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। তখনো কান পড়ে আছে ষ্টেশনের টুকরো টুকরো শব্দের শিলাবৃষ্টিতে: এই ফের হুইস্‌ল্‌ দিল, রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট সে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে। আবার কোথায় না জানি গিয়ে ট্রেন থামবে। সেখানে হয়তো লাইনের ধারে কারো বাড়ি নেই, দু'ধারে হয়তো ফাঁকা, ঢালু মাঠ। ষ্টেশনের লাল সুরকির সরু রাস্তাটা কত দূর গিয়ে শাদা হয়ে গেছে।

বুড়ি রতিকান্তর প্রথম সন্তান,—পনেরোটি বছরে শরীর প্রায় ভরো-ভরো; মা মারা যাবার পর আড়াই বছর ধরে সে-ই সংসার তদারক করে বেড়াচ্ছে। ক'টি লোকেরই বা রান্না-খাওয়া, বুড়িই একহাতে সব দেয়া-থোয়া করে—হাতের-পাঁচ একটা ঝি আছে, বুড়িকে কিছু আর ভাবতে হয় না। এত খাটা-খাটনির পরেও হাতে তার অনেক সময়।

বুড়ির পর দু' দু'টি ভাইয়ের মৃত্যুর পর ঘেঁষাঘেঁষি করে সাবি আর ছনু। সাবির বয়েস আট আর ছনুর এই প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর হলো।

ভাতের ফেন গালতে-গালতে বুড়ি রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে: সকাল থেকে উঠেই কী কতোগুলি মাটির হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসেছিস সাবি? ওদিকে ছেলেটা যে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে বাড়ি মাথায় করছে তোর কানে ঢুকছে না? যা শিগগির ওকে মুখ ধুইয়ে নিয়ে আয় এখানে। দেখছিস না আমার হাত জোড়া! ভারি উনি মেজ-দি হয়েছেন! যা, গেলি? বাবা এক্ষুনি তেড়ে আসবেন।

ছনু ছোট-ছোট হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে বুড়ির গলা জড়িয়ে ধরে: চলো দিদি, আমাকে গাড়ি দেখাবে চলো। আজ মা আসবে বলছিলে না?

হাতের কাছে ঘটির জলে তার চোখ ধুয়ে দিয়ে আঁচলে মুখ

মুহূর্তে-মুহূর্তে বুড়ি বলে: তুমি আগে খেয়ে নাও, পরে গাড়ি দেখাবো চলো।

ছন্নু দিদির কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার চিবুক তুলে ধরে জিগগেস করে: মা আজ আসবে ?

— আসবে বৈ কি, তুমি আগে খেয়ে নাও। না-খেলে মা কখনো আসে নাকি ?

রতিকান্ত ব্যস্ত পায়ে ভিতরে চলে আসে, গলা ছেড়ে হাঁক পাড়ে: বুড়ি।

ভয়ে ভয়ে নিতান্ত নিরীহ গলায় বুড়ি সাড়া দেয়: আজ্ঞে।

—ছন্নু কাঁদছিল কেন ? তোদের বলেছি না ওকে কখনো কাঁদাতে পারবি না। সাবিটা ফের ওর সঙ্গে মারামারি করেছে বুঝি ?

সাবি ভয়ে খুঁটির পেছনে লুকোয়, বুড়ি অপরাধীর মতো জড়ো-সড়ো হয়ে বসে থাকে।

ছন্নু প্রসন্ন গলায় বলে ওঠে: না বাবা, একটুও কাঁদছি না। দিদির কাছে বসে মুড়ি খাচ্ছি।

সে কাঁদলে যে দিদিদের উপর বাবা অসন্তুষ্ট হন এটুকু ছন্নু বুঝতে শিখেছে।

—ওর কান্না আমি কিছুতেই সইতে পারি না, রতিকান্তের গলা হাওয়ায় ভেসে আসে: ওর কান্না শুনলেই সব ছেড়ে-ছুড়ে কোথায় পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সারা দিনের মধ্যে ছন্নু বেশি আর কোনো গোলমাল করে না, নিজের খেলাধুলা নিয়েই সে মশগুল। বেতের মোড়াটাকে কখনো ঘোড়া বানায়, বাবার লাঠিটাকে দু'পায়ের মাঝখানে রেখে সমস্ত উঠোন সে ছুটোছুটি করে, থেকে-থেকে প্রায় গলা চিরে শব্দ করে ওঠে: পি—!

সাবি চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসে: বাবা এক্ষুনি মারতে আসবে, ছন্নু।

—বা, আমি কাঁদছি নাকি? আমি তো গাড়ি-গাড়ি খেলা করছি।

তারপর সন্ধ্যা হতে-না-হতেই খাইয়ে-দাইয়ে বুড়ি যখন তাকে ঘুম পাড়াতে আসে, তখন তার বুকের কাছে রাশীভূত আঁচলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সজলকণ্ঠে ছনু আরেকবার জিগগেস করে: কই, মা তো আজো এল না, দিদি? সেই গাড়ি কি এখনো আসে নি?

তার একরাশ অবিন্যস্ত চুলে চুলকে দিতে-দিতে বুড়ি বলে: আসবে বৈ কি। তুমি আগে ঘুমোও, কাল ভোরে দেখবে মা এসেছেন। না-ঘুমোলে মা কখনো আসে নাকি?

ছনু জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে-টানতে ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়িকে এখন আবার রান্নাঘরে উঠে যেতে হবে। নিজের খাওয়া আছে, বাবার ভাত বেড়ে রাখতে হবে। রান্নাঘরে ঢেকে না রেখে নিয়ে আসতে হবে তাঁর শোবার ঘরে। কখন তিনি বাড়ি ফেরেন ঠিক কী! খান-না-খান, ভাত রাখতে হবে সাজিয়ে, পরিপাটি করে। তারপব ঝিয়ের সঙ্গে বসে ঘর নিকোও, কুপি নেবাও, দরজায় তালা দাও। সে অনেক রাত।

ভাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বুড়ি ওঠবার উদ্যোগ করে, ও-পাশ থেকে এবার সরে আসে সাবি। কেমন অস্পষ্ট, অচেনা গলায় সে হঠাৎ কথা কয়ে ওঠে: তুমি সেদিন বলছিলে না দিদি, মা ঐ তারার দেশে চলে গিয়েছে?

বুড়ি রুক্ষ গলায়, নিজেরই অজানতে, ধমক দিয়ে ওঠে: তুই এখনো ঘুমোস নি লক্ষ্মীছাড়ি? এত বড়ো বুড়ো মেয়ে, তুইও আমাকে জ্বালাবি?

—না, এই ঘুমুচ্ছি, দিদি। বালিশে মুখ ঢেকে ঘুমোবার চেষ্টা করতে-কবতে সাবি বলে: কিন্তু অতো দূর পর্যন্ত কি ট্রেনের লাইন আছে?

অগত্যা বুড়িকে আবার বসতে হয়। তার চুলে আঙুল বুলোতে-বুলোতে বলে: মানুষে একদিন তা-ও করবে দেখিস।

—তারপর আমরা একদিন সেখানে বেড়াতে যাব? দিদির মুখে আর কথা নেই দেখে তার বিরক্তি অনুমান করে সাবি আবার তার দিনের গলায় বলে ওঠেঃ না, তুমি এবার যাও দিদি, খেয়ে এসো। আমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়বো দেখো। শুধু দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও, আলোর পল্‌তেটা আরো একটুখানি উস্কে দাও। মা এলে আমার কিন্তু দিদি, সত্যি ভারি ভয় করবে। মনে হয় ঠিক যেন মাকে চিনতে পারব না।

তার গালে মৃদু-মৃদু চাপড় দিতে দিতে বুড়ি বলেঃ না, তুই আগে ঘুমো।

কাজ-কর্ম সেরে সব পাট করে বিছানায় ফিরতে-ফিরতে বুড়ির তখন অনেক রাত। সমস্ত ষ্টেশনটি নিঝুম, লাইনের ও-পারে ঘুমন্ত বিশাল শূন্যতা। কখন ফের ট্রেন আসবে তারই প্রতীক্ষায় লাইন দুটো যেন কঠিন হয়ে আছে। বুড়ির চোখে ঘুম আসে না, কখন ট্রেন আসবে তারই আশায় সে-ও যেন অন্ধকারে চুপ করে বসে মুহূর্ত গুনছে।

তারপরে কত রাত করে না-জানি বাবা ফিরবেন। বুড়িকে উঠে দরজা খুলে দিতে হয়। ধাক্কা দিয়ে তক্ষুনি দরজা খোলা না পেলে আর রক্ষে নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে-থাকতে বুড়ি কেবল তার বুকের মধ্যে ট্রেনের শব্দ শোনে—সে-ট্রেন শূন্যতার সমুদ্র পেরিয়ে অনবরত তার দিকে এগিয়ে আসছে।

•

একদিন বুড়ির সেই ট্রেন তাদের উঠোনের উপর এসে দাঁড়ায়।

ভর দুপুর বেলা, রতিকান্ত তখন আপিসে, ঘরের দিকে লক্ষ্য রেখে কে ডেকে ওঠেঃ উষা। ছোট্ট একটি নামের হাওয়ায় বুড়ির সমস্ত গা থেকে শিশিরবিন্দুর মতো যেন লাবণ্য ঝরে পড়তে থাকে। তাড়া-তাড়ি গায়ের উপর আধময়লা শাড়ির খানিকটা ভাঁজ করতে-করতে বুড়ি বেরিয়ে আসে। তার নাম যে উষা সে যেন এই প্রথম

শুনল! তার একটিমাত্র পোশাকি শাড়ির মতো এই নামটিও সে তার বিস্মৃতির কৌটোয় সযত্নে তুলে রেখেছে।

গলার আওয়াজেই সে চিনতে পেরেছিল—অপূর্ব।

কুড়ি থেকে বাইশের কোঠায় তার বয়েসটা এক টুকরো কঠিন হীরের মতো জ্বলজ্বল্ করছে, যার সামনে সমস্ত পৃথিবীটা প্রায় একপাত কাঁচের মতোই ঠুনকো। জামায়-কাপড়ে দূর শহরের ঝাঁজালো একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত চেহারায় তারি যেন একটা গতির ঔজ্জ্বল্য। এইখানে, এই গেঁয়ো শহরে একটা দরিদ্রত্রাণ সমিতির পাণ্ডা-গিরি করে তার খুব নাম-ডাক। বুড়ির মা যখন মরতে চলেছে তখন এর নেতৃত্বে দলের লোকেরা কী সেবাটাই না সেবার করেছিল! তখন থেকেই এ-বাড়িতে তার যাওয়া-আসা। তবে আসবার সময় অপূর্বকে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিতে হয় রতিকান্ত তাকে ঠিক দেখে ফেলছে কিনা, তার ঐ চাউনিটাকে সে বড়ো পছন্দ করে না।

হাতের থেকে ব্যাগটা দাওয়ার উপর নামিয়ে অপূর্ব চুলগুলি উলটো দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—কলকাতার সেই চাকরিটা হ'যে গেলো। আগষ্ট মাস থেকে—তার এখনো দিন কয়েক দেরি আছে। ভাবলাম ক'দিন ফের বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক। কাল রাত্রের ট্রেনে এসেছি—সেই যেটা তিনটে পঞ্চান্নতে আসে। তোমাকে বলেছিলাম না, অপূর্ব দামী জামাকাপড়ে মাটির উপরেই বসে পড়ল: আবার আমি ফিরে আসব।

বুড়ি কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে,—একটা আসন এনে দিই।

—না, না, আসনে কী হ'বে? অপূর্ব তার ব্যাগের তালায় চাবি পরাতে লাগল: তুমি যে আমাকে একদম বিশ্বাস করো না তার একবার প্রমাণ দেখ। কী, ঠিক এলাম কিনা। তোমাকে বলে গিয়েছিলাম বলেই তো ফিরে এলাম, নইলে কাজ হয়ে যাবার পর কেউ বুঝি আবার আসে।

বুড়ির গলা বুজে এল: কিন্তু তেমনি তো তুমি আবার চলে যাবে।

—বেশ তো, তুমিও আমার সঙ্গে চলো না। অপূর্ব কথা একটা বলে ফেলে বাক্স থেকে কি-সব জিনিস-পত্র বার করতে লাগল।

মুহূর্তের জন্যে সমস্ত চেতনা স্তব্ধ করে বুড়ি তার শরীরে রক্তের একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য অনুভব করছিল—চোখের সামনে দিয়ে ঝাপসা করে দেখেছিল দ্রুতরেখার অপস্রিয়মান একটা প্রকাণ্ড ট্রেন। কিন্তু কথা একটা বলে ফেলার পর অপূর্বর মুখে এককণা আভা নেই যেন—ট্রেন চলে যাওয়ার পর ষ্টেশনের শুকনো শূন্যতা।

বুড়ি অবাক হয়ে বললে,—এত সব কিসের?

চোখ ভরে তাকে দেখতে-দেখতে অপূর্ব বললে,—তোমার জন্যে আনলাম।

—আমার জন্যে? আমি এ দিয়ে কী করবো?

—আলতা, এ দেবে পায়ে, মুখে মাখবে এ স্নো। কৌটোটা কেমন সুন্দর দেখেছ? আর এ তেলে চুল উঠবে তোমার ঘন হয়ে, পিঠ ভরে, তার ভার আর তুমি বইতে পারবে না। কথাকে কবিতা করে বলতে পারার নেশায় অপূর্ব বিহ্বল হ'য়ে উঠল: আর এ দেখ দু'গজ দিশি ভয়েল, তোমার দুটো ব্লাউজ হবে। সেলাই করতে যাতে তোমার সুবিধে হয় তার জন্যে কাঁচি, ছুঁচ, সুতো—সব এনেছি। এই দু'পাত সেফ্‌টিপিন, চুলের কাঁটা—আর এই আরেকটা জিনিস—বলো তো কী?

বুড়ি গম্ভীর হয়ে বললে,—এ-সব দিয়ে আমার কী হবে?

—বা, তুমি সাজবে।

—যা একটা পেত্নির মতো চেহারা, তার আবার সাজ।

—বটেই তো। দেখ দেখি একবার মুখখানা। অপূর্ব শেষ সম্ভার—রঙিন-ফুল-তোলা আয়নাখানি এবার তুলে ধরল।

—সেজেগুজে আয়নায় বসে নিজের মুখই দেখি আর-কি।

লজ্জায় বুড়ির লাবণ্য যেন আরো উথলে উঠল : বলে, বুড়ো হ'তে চললাম, তার কত ঢং।

—তোমার আরেকটা নাম উষা, সে-কথা তুমি বারে-বারে ভুলে যাও কেন? অপূর্ব ফের ব্যাগ হাতে করে উঠে দাঁড়াল : উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা—তুমি তা পড় নি?

ততক্ষণ ঘরের ভিতর থেকে সাবি আর ছনু এসে হাজির। জিনিসপত্রের বিশাল একটা পাহাড় দেখে সাবি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল : এ সব কার দিদি?

বুড়ি হেসে বললে,—আমার।

তার হাসির উত্তরে সাবির মুখে নেমে এলো গভীর ম্লানিমা। দেয়ালের ধারে সরে দাঁড়িয়ে সে শূন্য চোখে অপূর্বর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু ছনু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। এক হাতে স্নোর বাটিটা আঁকড়ে ধরে সে খুশী হয়ে বললে,—এটা আমার। তারপর ঝক্‌ঝকে কাঁচিটাও তার নজর এড়ায় নি, বাঁ হাতে নিলো সেটা কুড়িয়ে : এটাও।

ছুটেই হয়তো সে পালিয়ে যেত কিন্তু অপূর্ব তক্ষুনি তার মুঠি চেপে ধরেছে। নির্মম হাতে জিনিস দুটো ছাড়িযে নিতে-নিতে সে বললে—জিনিসগুলো যত্ন করে তুলে রেখে দাও, নইলে এরা সব এক্ষুনি নষ্ট কবে ফেলবে।

জিনিসদু'টো হস্তচ্যুত হতেই ছনু মাটিব উপব প্রবল কান্নায় গড়িয়ে পড়ল।

সে দিকে দৃকপাত না করে একটু সরে এসে বুড়ি বললে,—চললে?

—হ্যাঁ বেশিক্ষণ থাকবার কি জো আছে? অপূর্ব মুচকে একটু হাসল : তোমার বাবা আপিস থেকে—

—থাক, খুব বীরত্ব হয়েছে।

—বা, আমার কী! আমি যতক্ষণ না কেন বসি। তোমার জন্যেই তো তাড়াতড়ি চলে যেতে হয়—

—থাক্, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। যতটুকু এগিয়ে এসেছিল বুড়ি তার অনেক বেশি সরে গেল: কিন্তু আরেক দিন আসবে না?

চুলটা আরেকবার উল্‌টো দিকে ঠেলে দিয়ে অপূর্ব বললে,—দেখি। তবে যাবার আগে আরেকবার আসবো ঠিক। যেতে-যেতে অপূর্ব আবার ফিরে দাঁড়াল: তুলে রাখতে বললাম বলে জিনিসগুলো একবারে বাক্সে পচিয়ো না। ব্যবহার কোরো কিন্তু।

—কেন? বুড়ি অল্প একটু শব্দ করে হেসে উঠল: বাবাকে দেখাবার জন্যে?

—না, আমাকে দেখাবার জন্যে। সেজেগুজে আয়নাতে তুমি মুখ দেখলেই আমার দেখা হবে।

উঠোন পেরিয়ে অপূর্ব চলে যেতেই বুড়ি ছনুকে ধুলো থেকে তুলে নিলো। সাবি চোখ ছল্‌ছল্ করতে-করতে এগিয়ে এসে বললে,—সব, সমস্তই তোমার, দিদি?

—নে না, তোর যেটা ইচ্ছে।

ছনু লাফিয়ে উঠল: ওটা আমার, ওটা আমার।

জিনিসগুলি দু' ভাই বোনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে শুধু আয়নাটি সে তার নিজের জন্যে তুলে রাখল।

সে-রাতে বুড়ির হয়তো গা ভরে গভীর ঘুম এসেছিল, রতিকান্ত কখন যে দরজায় ঠেলা মারছে তার কানেই ঢোকে নি।

নাম ধরে ডাক, কড়া-নাড়া, তারপর একেবারে পা দিয়ে জোরে-জোরে ধাক্কার পর ধাক্কা। বাড়ি-ঘর যেন এখুনি ভেঙে পড়বে।

বুড়ি ধড়মড় করে উঠে বসল। মুখ উঠল অন্ধকার করে। লণ্ঠনটা উস্কে দিয়ে ছুটে গেল সে দরজা খুলতে।

দরজার উপর রতিকান্তর শেষ যেই লাথিটা মুখিয়ে ছিল সেটা ছিটকে পড়ল এসে বুড়ির উপর। বাঁ হাতে তার খোঁপাটা টেনে প্রায় ছিঁড়ে ফেলে ডান হাতে রতিকান্ত তাকে বেদম মারতে সুরু করলে- কিল, চড়, ঘুষি,—হাতে যখন যেটা ভালো খেলে। জড়িত গলায় সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে নির্লজ্জ গালাগাল : এই বয়সে এতো ঘুম কেন? আমি ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছি, আর উনি মৌরশি করে ঘুম মারছেন।

বুড়ি গুঙিয়ে উঠল; তার কান্না শুনে ছন্নু উঠল কেঁদে, সাবি ভয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

—একেবারে ঘুমিয়ে যেতে পারিস না হারামজাদি? মেঝের উপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রতিকান্ত টলতে-টলতে পাশের ঘরে চলে গেল।

নিজের কান্না ভুলে বুড়ি ছন্নুকে গেল শান্ত করতে। উঠে দরজায় খিল চাপিয়ে দিল।

কান্নায় বালিশের কানে সে বারে-বারে বলতে লাগল : এখানে সে কেন পড়ে আছে? তার মরে যেতে আর দোষ কী!

আরেক দিন বলতে ঠিক তার পরের দিনই যে অপূর্ব এসে হাজির হবে এতটা বুড়ি আশা করে নি। সকাল থেকেই তার জ্বর, তা নিয়ে সমস্ত সকালটা উনুনের পাশে কাটিয়ে শরীর এখন তার নেতিয়ে পড়েছে, হঠাৎ জ্বরের উপর যেন ঘাম দিল। কিন্তু কে জানে, হয়তো আজ রাত্রেই তার ফিরে যাবার ট্রেন।

—উষা!

আজ আর বুড়ি দাওয়ায় ছুটে যেতে পারল না, অপূর্ব উঠে এলো ভিতরে।

—এ কী, শুয়ে আছ কেন? কী হয়েছে?

চোখের উপর থেকে রুক্ষ চুলের বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ ক'টি সরিয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ করে চেয়ে বুড়ি বললে,—জ্বর হয়েছে।

ছন্নু কোথায় বাবার লাঠি নিয়ে গাড়ি-গাড়ি খেলতে গেছে, সাবি ছিল কাছে। মুরুব্বিয়ানা করে বললে,—কাল রাতে বাবা দিদিকে ভীষণ মেরেছে। পিঠের ওপর চাপটা-চাপটা দাগ।

বুড়ি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : তোর আর পাকামো করতে হবে না তো।

সাবি ভারি গলায় বললে,—কিছু খায় নি, এতক্ষণে ঝি গেছে পালো কিনে আনতে।

তার গায়ে একটা ঠেলা মেরে বুড়ি বললে,—তুই এখন এখানে থেকে যা দেখি সর্দারনি, দেখতো ঝি ফিরল কি না।

ম্লানমুখে সাবি চলে গেলে বুড়ির জ্বরের উত্তাপ নিতে অপূর্ব তার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর কোনো কথা নয়, তার শিথিল, শীর্ণ একখানি হাত চেপে ধরে অপূর্ব দীপ্ত গলায় বললে,—তুমিও চলো।

বুড়ি তো অবাক। হাসবে না ভয় পাবে কিছু বুঝতে না পেরে সে শুকনো গলায় বললে,—কোথায় যাব ?

—কলকাতায়। আমার সঙ্গে। আমি কালকেই আবার চলে যাচ্ছি কিনা—রাত দশটার ট্রেনে। যেটা বরাবর এখান থেকে ছাড়ে।

—কালকেই ?

—হ্যাঁ, এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম পেলাম—ভাঙা মাস থেকেই আমাকে কাজে বসতে হবে। হাতে আরেকটু চাপ দিয়ে অপূর্ব বললে,—চলো, তোমাকে আমি নিয়ে যাব।

—তুমি পাগল হলে নাকি ? আমি যাব কোথায় ?

—তবে এইখানে বসে পড়ে-পড়ে মার খাবে নাকি ? অপূর্ব অসহিষ্ণু হয়ে বললে,—শুধু কালকে নয়, প্রায়ই। এ নিয়ে পাড়ায় কান পাতা দায়—আমাকে তুমি কিছু লুকোতে পারবে নাকি ভেবেছ ?

ঘুলো-ঘুলো চোখ তুলে বুড়ি বললে,—বাপ তার সন্তানকে মারবে এতে পাড়ার কার কী মাথা-ব্যথা শুনতে পাই? আমি কখনো কারু কাছে নালিশ করতে গেছি?

—এ নালিশ করতে হয় না, আপনা থেকেই সবাই বুঝতে পারে। তোমার বাবার কীর্তিকে তুমি ঢাকতে পারবে না, উষা। অপূর্ব ঈষৎ বিষণ্ণ আঙুলে তার চুলের জট ছাড়াতে লাগল: কিন্তু তোমার যদি বিয়ে হয়ে যেতো, তবে তোমার স্বামী চুপ করে তোমার ওপর এই অত্যাচার সহ্য করত নাকি ভেবেছ?

বুড়ির গলা প্রায় বুজে এল: তা, বিয়ে তো আর হয় নি।

—হয় নি, হবে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমার চাকরি হয়েছে, তুমি গেলে মেস্‌এ না উঠে আমি একটা বাড়ি-ভাড়া করব। তোমার একটুও কষ্ট হবে না।

ভীত, পাংশু মুখে বুড়ি অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল: তুমি কী বলছ যা তা?

—যা-তা নয়, স্পষ্ট সত্য কথা। এখানে থাকবার তোমার কী মানে আছে, সমস্ত জীবন তুমি এই ঘানি টানবে নাকি? তোমার জীবনের এইটুকু মাত্র পরিসর, তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার এইখানেই শেষ? গভীর মমতায় তার কপালের উপর অপূর্ব একখানি হাত রাখল: তোমার কিছু ভয় নেই, উষা! আমিই তো তোমার আছি।

—কিন্তু পালিয়ে যাবো কী বলছ?

—তা ছাড়া উপায় কী? বুদ্ধিমানরাই পালায়। জীবনের বড়ো একটা সার্থকতার কাছে এ-সব কিছুই চিন্তা করবার নয়। অপূর্ব গলায় জোর দিয়ে বললে,—আমাদের যখন বিয়েই হচ্ছে তখন পালানো না-পালানোয় কী এসে যায়!

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন বুড়ির প্রাঞ্জল বোধ হলো। গায়ে দিল যেন ঝিরঝিরে হাওয়া। শরীরের প্রতিটি রেখায় ফুটল ধার, রক্তে জাগল ঢেউ।

বেশিক্ষণ নয়, গলা এল ফের অবসন্ন হ'য়েঃ কিন্তু ছনু, সাবি—ওদের ফেলে যাব কী করে? তুমি পাগল হলে নাকি?

—তোমার মা-ও ওদের স্বচ্ছন্দে ফেলে গেছেন। অপূর্ব যেন একটা ধমক দিয়ে উঠলঃ তোমার বাবাও ওদের ফেলে নিশ্চিন্তে নিশাচর হয়ে উঠেছেন। যত দায় পড়েছে তোমার! তুমি ওদের কে,—আজ তোমার বিয়ে হলে কাল তুমি ড্যাং-ড্যাং করতে-করতে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। তোমার কী! তুমি কি এ-সংসারের লোক নাকি? এইখানেই তোমার ভাত মাপা আছে নাকি চিরকালের?

আঘাতে বুড়ি যেন একেবারে অবশ হয়ে পড়লঃ সেই জন্যেই তো বাবা বিয়ে দিচ্ছেন না।

—আর নিজে করে বেড়াচ্ছেন এই কেলেঙ্কারি। যেন তোমারই কেবল কিছু সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই। তোমার বাবার খেয়াল মেটাবার সুবিধে করবার জন্যেই যেন তুমি এখানে আছ। অপূর্ব তার হাত ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলঃ না, তুমি চলো। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ অনেক আসে না। ওদের জন্যে মিছিমিছি তুমি কেন ভাবতে যাচ্ছ? মাথার ওপরে ওদের বাবা নেই? নিজেকে এই ভাবে বঞ্চনা করা ভীষণ পাপ, উষা, তুমি চলো।

অপূর্বর হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বুড়ি ফুঁপিয়ে উঠল।

অপূর্ব একটু নুয়ে পড়ে বল্‌লে,—কাল রাত দশটায় ট্রেন, আমি সাড়ে ন'টা নাগাদ আসবো তোমাকে নিয়ে যেতে—এই তো এইটুকুন মোটে রাস্তা। কিছু ভয় নেই, তোমার বাবা তো তখন বাড়িতেই থাকে না, সাবি আর ছনুকে তুমি ঘুম পাড়িয়ে রেখো। বলো, যাবে তো?

এত সুখ যে, বুড়ির ভীষণ ভয় করতে লাগল, শূন্য চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বললে,—তুমি যদি বলো যাব।

অপূর্ব দৃপ্ত একটা ভঙ্গি করে বললে,—সংসারে তোমার ওপর সবার চেয়ে আমার দাবি বেশি। আমি এখানে তোমাকে বাপের লাথি খাওয়ার জন্যে ফেলে রাখতে পারি না। দু'টো দিন আগে বলেই আমার অধিকার আমি জাহির করবো না, তা নয় উষা। সংসারে মেয়েছেলের ভাই-বোন-বাপই বেশি নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু তার আছে।

বুড়ি গাঢ় গলায় বললে,—সে আমি বলেছি? ছনু আর সাবি মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে কল্‌কাতায় গিয়েও তো বেড়িয়ে আসতে পারবে। আমাদের তো তখন বাসাই হবে বললে।

—হ্যাঁ, অপূর্ব উঠে দাঁড়াল: কিছু তোমার জিনিস-পত্র নিতে হ'বে না। পৃথিবীতে জিনিস অনেক হয়, সুযোগই শুধু আসে না। তুমি কিন্তু তৈরী হ'য়ে থেকো, উষা, আমি ঠিক আসব। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ।

আশ্চর্য, বুড়ি কিন্তু সেই মুহূর্তেই তৈরী— কতো যুগ পরে যে কালকের দশটা-রাত এসে হাজির হবে তার ঠিকানা নেই। সত্যি তার মনের মধ্য থেকে কে যেন বার-বার বলতে লাগল: মানুষের জীবনে এমন সুযোগ অনেক আসে না। না, এই সুযোগের দরজা দিয়ে জীবনের এই জেলখানা থেকে সে পালিয়ে বাঁচবে! তার চোখের সামনে ছোট, পরিচ্ছন্ন একটি সংসার নিকেতনের ছবি উঠল ভেসে। সেখানে সে সবময়ী কর্ত্রী, তার কিনা অপূর্বর মতো স্বামী। সত্যিই তো তার কোথায় আর কিছু ঋণ থাকতে পারে না। ছনু দেখতে-দেখতে কত বড় হয়ে উঠবে,—পুরুষমানুষ, কার কী সে তোয়াক্কা রাখে? আরো ভালো ঘর দেখে সাবির বিয়ে হয়ে যাবে —নদীতে-নদীতে দেখা হয়, তবু দুই বোনে দেখাই হবে না হয়তো কোনদিন। না, মানুষের জীবনের সুযোগ ঝাঁক বেধে আসে না। প্রচণ্ড শীতের রোদে সে কুড়িয়ে পেয়েছে একটি আগুনের কণা— তাকেই সে আঁচলের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখবে, জীবনে যা দেবে

তাপ, আলো আনন্দ। সমস্ত শরীর তার সেই আগুনে উঠল ঝলমল করে।

প্রথম রাতটা বুড়ির স্বপ্নে কাটল বিভোর, কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই তার চারপাশে ঘনিয়ে উঠছে অজানার অন্ধকার। দিনের বেলায় দ্রুত, উচ্চকিত পদক্ষেপগুলি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেল কুণ্ঠার কুয়াশা। অন্ধকারে সত্য যেন আরো স্পষ্ট, আরো উলঙ্গ হয়ে উঠল—দিনের আলোয় যা ছিল স্বপ্নে রঙিন, অনুভবে প্রচ্ছন্ন—এখন যেন সেই চেতনাটা তার বুকে এসে আঘাতের মতো লাগছে।

তা হলে অপূর্ব আর তাকে ডাকতে না আসুক, নিজেই একা চলে যাক ট্রেনে করে। ভাবতেও বুড়ির শরীরের সমস্ত স্নায়ু-শিরা চীৎকারে ছিঁড়ে পড়ে—অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে দুই হাত আঁকুপাঁকু করে ওঠে। আত্মহত্যার চাইতেও তা অসহ্য ব্যর্থতা।

আজকে সন্ধ্যার পরেই কাজকর্ম সব চুকে গেছে—তালা পড়েছে রান্নাঘরে। রতিকান্ত সেই কখন বেরিয়ে গেছে। সাবিও পড়েছে ঘুমিয়ে। শুধু, কেন কে জানে, ছনুর চোখেই আজ ঘুম নেই।

এতদিন যে লাঠিকে রেলগাড়ি বানিয়েছে, আজ সত্যি-সত্যি পাশের বাড়ির সেকেণ্ড মাষ্টারের ছেলে বড়ো শহর থেকে কিনে এনেছে এক সত্যিকারের রেলগাড়ি। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কী খানিকটা ঘুরিয়ে দিলেই গাড়িটা এঁকে-বেঁকে চলে, অনেকক্ষণ চলে। ছনুর আবদার অমনি তার একটা গাড়ি চাই।

বুড়ি তাকে কতো বুঝিয়ে বললে, - তোমার গাড়ি ওর চেয়ে কতো ভালো। ওর গাড়ি তো কতোটুকু গিয়েই থেমে পড়ে—আর তুমি গাড়ি নিয়ে ঐ কতোদূরে অশথ গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারো। ওর গাড়ি তো শব্দ করতে পারে না, আর তুমি কেমন থেকে-থেকে হুইস্‌ল্ দিয়ে ওঠো, পি—!

ছন্নু দিদির হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বললে,—ও শব্দ আমার লাঠি করে নাকি ? ও তো আমি করি।

তাকে বোঝানো বৃথা। কেঁদে কেটে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে সে একটা কাণ্ডই বাধালো যা-হোক। কাঁদতে-কাঁদতে যখন সে অবসন্ন হয়ে আসে তখন হঠাৎ তার মার কথা মনে পড়ে যায়, বা, মা বলে কাকে সে মনে-মনে দাঁড় করায়। মা থাকলে নিশ্চয় তার গাড়ি হতো।

আর, মা'র কথা উঠলেই সাবি আসে দিদির পাশ ঘেঁষে। দিদির মুখে মা'র সম্বন্ধে মিথ্যাকথাগুলি শুনতে সাবির খুব ভালো লাগে।

—কাল মা গাড়ি নিয়ে আসবেন, মুখে আব ছন্নুকে 'পি' বলতে হবে না— এই প্রতিজ্ঞা করাতে তবে ছন্নু চুপ করেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দিদিব গলা জড়িয়ে। আর, দেখবো কেমন কাল মা আসেন, সঙ্গে আবাব টিনের একটা দম-দেওয়া গাড়ি—মুখে এমন একটা অবিশ্বাসের ভাব মিশিয়ে সাবিও গেছে ঘুমের কোলে ডুবে।

কালকের কথা কাল, আজ তো ওরা ঘুমুক।

বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে অন্ধকারে, শোনা যাচ্ছে ষ্টেশনের টুকিটাকি শব্দ। কলকাতাব গাড়িটা বুঝি এই ইন্ হলো—আস্তে আস্তে কামরায় জ্বলে উঠলো আলো; এক আধজন করে' লোকও বুঝি উঠতে লেগেছে। অপূর্ব বুঝি তবে আর এলো না। এ-ও বুঝি তার আর-আর রাতের মতো একটা সাধারণ, সহজ রাত—যে রাতে বাবার জন্য উঠে দরজা খুলে দিতে হয়, ঘুমের মধ্যে ছন্নু কেঁদে উঠলে গুন্‌গুন্ করে ছড়া কাটতে হয়! বুড়ি অসহায় আর্তকণ্ঠে একটা প্রায় চীৎকার করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু না, ঐ বুঝি উঠোনে অপূর্বর পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি ছন্নুকে সে বুকের মধ্যে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল—কাল ভোরে উঠে দিদিকে সে আর দেখতে পাবে না। তাতে কী ? বড়ো হলে দিদির তো সে ভারি তোয়াক্কা রাখবে!

না, অপূর্ব নয়, পাতা ফিস্‌ফিসিয়ে-তোলা একটা বুনো হাওয়া। এদিকে ষ্টেশন উঠেছে সরগরম হয়ে, গাড়ি ছাড়বার বুঝি আর বেশি দেরি নেই। এলো না তো এলোই না, মিছিমিছি তার আশায় সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে একটু খুশি করে তোলা। বুড়ি তা জানতো, অনেক আগে থেকেই জানতো। ছেলেরা ও রকমই বলে থাকে, যাবার ঠিকঠাক করে পরে আর আসে না। কেনই বা আসবে? শুধু নাম একটা ভালো থাকলেই তো হয় না।

বুড়ি ছন্নুকে আরো কাছে টেনে আনল, তার চোখের পাতা এল ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে!

উষা! উষা! দরজায় তক্ষুনি কে ধাক্কা দিতে সুরু করেছে।

বুড়ি হকচকিয়ে উঠে পড়লো। নিশি পাওয়ার মতো কি করছে কিছু বুঝতে না পেরে দরজা খুলে বাইরে এলো বেরিয়ে। বিকেলে চুল বাঁধবারো তার সময় হয় নি, পরনের শাড়িটায় নেই এতোটুকু ভদ্রতা। দাঁড়ালো এসে, যেন ফাঁসিকাঠে উঠেছে।

অপূর্ব ঝাঁজিয়ে উঠলো: এ কী, একেবারে দোর দিয়ে বসে আছ যে। যাবে না?

ঘরের লণ্ঠনের আলোয় বাইরের বারান্দাটা আবছা করে আছে। সেই ঘোলাটে আভায় বুড়ি দেখলো অপূর্বর একেবারে বরের মতো রাঙা টুকটুকে চেহারা। খুশিতে ছলছল করতে-করতে বললে,—কিন্তু তুমি যে সত্যিই আসবে তা ভাবিনি।

—ভাবো নি মানে? এ একটা ঠাট্টা করবার মতো কথা নাকি? তোমাকে আমি ভালোবাসি, এ একটা শুধু মুখের কথা মনে করলে?

বুড়ি সামান্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো: আস্তে। কথা শুনে ছন্নু আবার জেগে উঠতে পারে। আমি আসছি।

বুড়ি ঘরের দিকেই ফিরে যাচ্ছিল, অপূর্ব তার হাত চেপে ধরলো: না, তোমাকে সাজগোজ করতে হবে না, ট্রেনের আর সময় নেই, এঞ্জিন লেগে গেছে, টিকিট কেটে আমি একটা কামরায় জিনিস-

পত্র চাপিয়ে, একটা লোকের জিম্মায় রেখে এসেছি। তুমি চলে এসো এক্ষুনি।

অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী যেন নিরাশ্রয় শূন্যচারী একটা বিন্দুর মতো দুলতে লাগলো। অপূর্বর আকর্ষণের মাঝে হাত শিথিলতরো করে দিয়ে ম্লান গলায় বুড়ি বললে,—কিন্তু দরজাটা যে খোলা রইলো—

—থাক খোলা, কয়েদি যখন পালায় তখন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে যায় না। তাড়াতাড়ি চলো, ষ্টেশনের এই এক পা পথ পেরিয়ে গেলেই আমরা নতুন মানুষ।

—কিন্তু, বুড়ির হাতের পাঁচটি আঙুল কাকুতি করে উঠলো : লণ্ঠনটা শুধু-শুধু জ্বলবে, ওটা নিবিয়ে দিয়ে আসি .

—জ্বলুক না। তুমি চলে এসো।

—এখুনি কী? আরেকটু দাঁড়াও। কী মনে করে বুড়ি মুহূর্তের জন্য কঠিন হ'য়ে দাঁড়ালো : কাল সকালে উঠে ওরা কী খাবে কিছুই যে এখনো বন্দোবস্ত করে রাখি নি।

—কাল কোরো। এখন তুমি চলো।

—দাঁড়াও, আর একসেকেণ্ড। ওদের মশারিটা একবারটি টাঙিয়ে দিয়ে আসি।

—কিন্তু ওদিকে গাড়ি যে ছাড়ে।

বুড়ির মুখ চুপসে গেলো। দু'পা এগিয়ে এসে আবার থামল, করুণ গলায় বললে,—ওদের মুখ আর আমি একদম মনে করতে পারছি না। চুপি-চুপি একবারটি গিয়ে দেখে আসতে-আসতে তোমার ট্রেন কি ছেড়ে যাবে?

অপূর্বর মুখে আর কথা নেই। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামল, পিছনে এক পা দু'পা করে' বুড়ি। অথচ, এক হাতও নয়, ঘরের মধ্যে ছনুরা শুয়ে আছে। আর পিছন ফিরবার পথ নেই, শুধু এগিয়ে চলো। উঠোন পেরিয়ে রাস্তাটা, আর রাস্তাটা না ফুরোতে-ফুরোতেই ষ্টেশন।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে এঞ্জিনের হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠল।

অপূর্ব বললে,—সর্বনাশ।

বুড়ি পাংশু শুকনো মুখে জিগগেস করলে : কী ওটা ?

—জানো না, কী ? হুইস্‌ল্‌,—আমাদের যাবার বাঁশি। চলো পা চালিয়ে, ঠিক ধরে ফেলতে পারবো। ঐ দেখ অনেকে ছুটোছুটি করে উঠছে, এখনো সময় আছে। দাঁড়িয়ে আছ কি হাঁ করে ? চলে এসো বলছি। অপূর্ব তার হাত ধরে সজোরে একটা টান মারল।

বিমূঢ় চোখে চেয়ে থেকে বুড়ি নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—কে, ছনু কেঁদে উঠল না ?

—তুমি থাকো তোমার ছনুর কান্না নিয়ে, আমি চললাম।

—দাঁড়াও।

—তবে এসো শিগগির। আমি আগে যাই, গার্ডকে বলে আর দু' মিনিট ট্রেনটা দাঁড় করাই গে। একটু ছুটে এসো, মেয়ে হয়েছ বলে কি সব সময়েই গজেন্দ্রগমনে চলবে ?

কিন্তু আবার হুইস্‌ল্‌।

অপূর্ব প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেছে, গাড়ি দাঁড় করিয়েছে হয়তো। অন্ধকারে এ-বাড়ির দিকে সঙ্কেত করে হাতছানি দিচ্ছে ঘন-ঘন।

কিন্তু সেই ডাক অনুসরণ করে পথ ভুলে বুড়ি চলে এসেছে ঘরের মধ্যে। তার ছনুর বিছানায়।

সমস্ত রাস্তা ট্রেনের চাকা ও ষ্টিমারের প্যাড্‌ল্‌এ অমিয় কেবল তাহার আনন্দস্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের প্রতিধ্বনি শুনিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া তাহার ছিন্নবিচ্ছিন্ন কোলাহলের ঝাপটায়ও সেই সুরটি হারাইয়া গেল না।

ফিরিয়া আসিতে-না-আসিতেই সাতদিনের মধ্যে রঙ্গিলার চিঠি আসিয়া হাজির। কোথা হইতে মোটা খসখসে কাগজ ও বেমানান রঙিন খাম যোগাড় করিয়াছে কে বলিবে। গোটা গোটা অক্ষরে মাত্রা না টানিয়া, অগণন ভুল বানান করিয়া সে কী এক দীর্ঘ চিঠি! এক নিশ্বাসে কত কথা যে লিখিয়া ফেলিয়াছে তাহার অন্ত নাই। তাহাব পাগলামি দেখিয়া অমিয়র দস্তুরমত হাসি পাইল।

যখন যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই সে মন খুলিয়া লিখিয়া গিয়াছে। লিখিয়াছেঃ তুমি আবার কবে আসিবে? আমলকি গাছের উপর দিয়া আজ কেমন সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে, কলিকাতায় বসিয়া আমার এই চাঁদ কি তুমি দেখিতে পাও? সত্যি, বেশি যেন দেরি করিয়ো না। তোমার পরীক্ষার তো আর মাস চারেক বাকি, তাহার পব আমাকে তুমি এখান হইতে লইয়া যাইয়ো, যেখানে তোমার খুশি, যেখানে তোমার চক্ষু যায়। তুমি সেই যে রাত্রের ট্রেনে চারপাশের অন্ধকার কাঁপাইয়া চলিয়া গেলে দিনরাত্র সেই ট্রেনের শব্দ আমি যেন আমার বুকের মধ্যে শুনিতে পাইতেছি। বলিতে পারো আমি এইখানে কেন আর এমন করিয়া পড়িয়া থাকিব? তুমি একবার আসিযা ডাক দিলেই আমি বাহির হইয়া পড়ি, তোমার সেই ট্রেন আবার কবে ফিরিয়া আসিবে? আর মোটে চার মাস বাকি, পাঁজিতে এই চার মাস লেখা না থাকিলে পৃথিবীর কী ক্ষতি হইত? আর চার মাস পরেই তো তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে

পারিবে, বলিয়াছ। তাহার পরেই তো তুমি গ্রাজুয়েট। সেই যে দরজার ফাঁকে তোমার আঙুল চিপিয়া গিয়াছিল তাহা কেমন আছে? সত্যি আজ তুমি কাছে থাকিলে, সেই দিনের মত তোমার মাথাটি কোলের উপর টানিয়া আনিয়া ডান দিকে সিঁথি কাটিয়া দিতাম। ডান দিকে সিঁথি কাটিলে তোমাকে যে কত সুন্দর দেখায় তাহা তুমি নিজেই জানো না। আমি কিন্তু তোমার বাঁ দিকের সিঁথি কিছুতেই বরদাস্ত করিব না।

আরো এমনি কত কথা। একেবারে ছেলেমানুষ। সেন্টিমেন্টা-লিটির একটা পচা পাতকুয়ো। অমিয়র দস্তুরমত হাসি পাইল। গেঁয়ো, অশিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে, যাহাই বলো, প্রেম করিয়া সুখ নাই।

অমিয়ও চিঠি লিখিল অবশ্য। কিন্তু সে কাঁচা ছেলে নয়, ও সব ভাবের ধোঁয়ায় সে চিঠি ফাঁপাইল না, কেননা রঙ্গিলার নামের চিঠি আগে নিশ্চয়ই অন্য কাহারো হাতে পড়িবে।

নরম, নিরীহ, লিখিল একখানি শাদাশিদে চিঠিঃ তোমাদের দেশে গিয়া এবারের ছুটিটা আমার সার্থক হইয়াছে। মেসোমশাই শিগগির বদ্‌লি হইয়া যাইবেন শুনিতেছি। তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হইবে জানি না। দেখা না হইলেও তোমাদের কাহাকেও কোনোদিন ভুলিতে পারিব না। বাটি ভরিয়া তোমার মা'র সেই রসপুলি খাইতে দেওয়া আমার আমরণ মনে থাকিবে। পুকুরের সেই টাটকা মৃগেল মাছের স্বাদ আমার মুখে এখনো লাগিয়া আছে। আর, জানালার পাশেই নতুন নেবু ফুলের গন্ধ। জলে হাত পা মেলিয়া সাঁতার দেওয়া, ঘুড়ি ওড়ানো, গরুর গাড়ি চড়া, থিয়েটার করা —কিছুই, কিছুই আমি ভুলিব না। আশা করি রোজ একটু-একটু করিয়া পড়াশুনা করিতেছ, সময় পাইলে আমি তোমাকে খানকতক ভালো বই পাঠাইয়া দিব—দেশ-বিদেশে যে-সব মনীষীরা খুব বড় হইয়াছেন তাঁহাদের অমর কাহিনী। কেমন? পড়িয়া অনেক শিখিতে পারিবে।

রঙ্গিলা তক্ষুনি আবার চিঠি লিখিল। খানিক ঠাট্টা করিয়া খানিক মুখ গম্ভীর করিয়া খানিক-বা চোখ কাঁদ-কাঁদ করিয়া। অমিয় মনে-মনে দস্তুরমত অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল।

লিখিয়াছেঃ না, দেখা আর কোনোদিন হইবে না-ই তো। কলমের আঁচড়ে যাহা খুশি একটা লিখিলেই হইল। আমাকে তুমি নিজমুখে কথা দিয়া গিয়াছ—তাহাও আশা করি তুমি ভোল নাই। চিঠিতে অন্য লোক ঠকাইতে গিয়া আমার চোখে তুমি ধূলা দিতে পারিবে না। তারপর সেই দিন—তুমি আমার কত আপনার, সেই কথা আমি, তুমি ও ঈশ্বর ছাড়া আর কেহ জানে না। কোনো একটা কারসাজি করিয়া, কবে তুমি আমাকে নিতে আসিবে তারিখটা আমাকে জানাইয়া রাখিয়ো। হিসাব করিয়া দেখিলাম চার মাসের মধ্যে গিয়াছে মোটে কুড়ি দিন। মানুষ এত দিন বাঁচে কি করিয়া ?

তুমি জানো, আমি তোমাকেই কেবল চিনি, বা তুমিই আমাকে প্রথম চিনাইলে। তার আগে আর আমার কোনো পরিচয় নাই। এতদিন আমি ছিলাম না, তোমার থেকেই আমার আরম্ভ হইল। মুখে এত কথা মরিয়া গেলেও বলিতে পারিতাম না, কিন্তু সেইদিন নিবিড় বিশ্বাসে তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ইহারই গভীর, নিঃশব্দ ভাষা।

ভালো বই অনেক দেখিয়াছি, দয়া করিয়া তুমি আর অত্যাচার করিয়ো না। টাটকা মৃগেল মাছের স্বাদ লইয়া তুমি থাকিয়ো, মাঝে-মাঝে তোমার চিঠি পাইলেই আমার দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিবে। সত্যি, তুমি কবে আসিবে ? তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বলিয়া-কহিয়া পরীক্ষার তারিখটা কয়েকদিন কোনোরকমে আগাইয়া আনিতে পারো না ? শরীর কেমন আছে ?

অমিয় এক নতুন মুশকিলে পড়িল দেখিতেছি। মুখে একটা কথা দিয়া আসিয়াছি বলিয়াই তাহা অক্ষরে-অক্ষরে রাখিতে হইবে এমন কথা ঘুণাক্ষরে কে কবে শুনিয়াছে ? অমন দু-একটা রঙিন মিথ্যা

কথা না বলিলে প্রেমের আবহাওয়াই তৈরি হয় না। কবিতার উপমার মতই অমন দু-একটা কথা রসকে আরো ঘন করিয়া তোলে। বুদ্ধিমতী হইলে রঙ্গিলা নিজেই তাহা বুঝিতে পারিত।

সেই দিনের কথা অমিয়র মনে আছে বৈ কি। পাকুড়তলায় যাত্রা হইতেছিল। সারি-সারি চিক ফেলিয়া মেয়েদের জায়গা করা হইয়াছে। অমিয় বারে-বারে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, রঙ্গিলাদের বাড়ির সবাই আসিয়াছে, শুধু সেই আসে নাই। লোকের ভিড়ে বসিয়া সামান্য একটা যাত্রা দেখিতে পর্যন্ত তাহার বারণ। অমিয়রও আর যাত্রা দেখা হইল না। সোজা রঙ্গিলাদের বাড়িতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার জন্য ভীষণ মন কেমন করিতেছিল, তাহার বাড়ির লোকের মত সে স্বার্থপর নিষ্ঠুর নয়।

ঘরের এক কোণে রাতের অন্ধকারে বসিয়া রঙ্গিলা ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সে-কান্না তাহাব যাত্রা না-দেখার দুঃখের অনেক অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইল। অমিয়কে দেখিয়া রঙ্গিলা তাড়াতাড়ি একটা আলো জ্বালাইল। কেন যে সে আসিয়াছে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না—শুধু আলোর বিশীর্ণ শিখাটিব মত আনন্দেব একটি ক্ষীণ ধারা তাহার শরীরে সহসা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিল। ম্রিয়মান, মলিন, বঙ্গিলার নির্বোধ সরল মুখখানিব দিকে চাহিযা অমিয়র যে কী মায়া করিতে লাগিল বলিয়া তাহা শেষ কবা যায না।

না, বাজে কথা ভাবিবার তাহাব এখন সময নাই। পবীক্ষা একেবারে তাহার দোরগোড়ায় আসিয়া পড়িযাছে। থিওরি অফ ভ্যালু-টা তাহার কিছুই তৈরি হয নাই এখনো।

তারিখ একটা পাইলেই যদি বঙ্গিলা সন্তুষ্ট হয়, অমিয় দু' কলম লিখিয়া দিল যতদূর সংক্ষিপ্ত হইতে পাবে। লিখিয়া দিল: সাতুই এপ্রিল তাহাদের পরীক্ষা শেষ হইবে। তাহার পরই সে ফাঁকা, তাহার পায়ের নিচে দিগন্ত পর্যন্ত পথ পড়িয়া আছে।

রঙ্গিলার চিঠিও ইদানীং সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ভাষায় আর সেই তারল্য নাই। তাহার স্বরে মুখের যে প্রচ্ছন্ন আভাস মিলিতেছে তাহা যেন দুর্ভাবনায় গম্ভীরতম, দুই চোখে যেন তার তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষা।

কিন্তু অমিয় কী করিতে পারে? চিঠি লিখিয়া সময় নষ্ট করার চেয়ে দু' পাতা একটা রচনা লিখিলে বরং কাজ দিবে। মানুষ হইতে হইলে অমন গলিয়া পড়িলে চলে না।

শেষকালে রঙ্গিলার যা একখানি চিঠি আসিয়া হাজির হইল, ওয়াল্-গেজেটে তাহার নামের পাশে নীল পেন্সিলে টিকা দেওয়া দেখিলেও অমিয় তত চমকাইত না। এইটুকু মেয়ে, এত সব একনাগাড়ে কী লিখিয়াছে—এত কথা সে শিখিলই বা কোথা হইতে। অমিয় চিঠিটা কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আর অনুনয় নয়, দস্তুরমতো রঙ্গিলা তাহাকে পুলিশের ভয় দেখাইয়াছে। আইন করিয়া সে ভালোবাসা আদায় করিবে। যদি সে নিজের ভালো চায় তবে সে যেন পত্রপাঠ চলিয়া আসে। রঙ্গিলা প্রতি মুহূর্তেই প্রস্তুত।

কিন্তু এত সকালেই অমিয় বিবাহ করিবে কী! আর বিয়ে যদি করে-ই শ্বশুরের ঘাড় ভাঙিয়া বিলাত যাইতে না পারিলে পয়সা খরচ করিয়া সে কী এমন লেখাপড়া শিখিল! বাবার কাছে এই বিদ্ঘুটে বিয়ের কথা পাড়িবার মত বুকের পাটা তাহার নাই, মেসোমশায় শুনিলে কেলেঙ্কারির শেষ থাকিবে না! কিন্তু কী-ই বা করা যায়!

আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে না লেখা হইল একখানি চিঠি, না বা হইল যাওয়া।

রঙ্গিলার আরেকখানি চিঠি আসিল। আবার কী ভীষণ দুঃসংবাদ না-জানি ঐ খামের মধ্যে লুকানো রহিয়াছে। ভয়ে অমিয় তাহা খুলিতে পারিল না, মোড়কের উপর বাঁ হাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে

লিখিয়া দিল : মালিক এখান হইতে আর কোথাও উঠিয়া গিয়াছে। চিঠি ফেরৎ গেল।

তাহার বহিয়া গেছে। যে-দিকে হোক সরিয়া পড়িলেই হইল। প্রেমের পথ দুর্গম, কবিরা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এমন যে দুষ্কণ্টক তাহা কে জানিত।

যতই দিন যাইতে লাগিল দুশ্চিন্তায় ততই সে অস্থির, দিশাহারা হইয়া উঠিতেছে। কি করিয়া যে কী পরীক্ষা দিবে কিছুই সে ভাবিয়া পায় না। অথচ মন স্থির করিয়া পড়িতে পারিলে তাহার ফার্স্ট-ক্লাশ-ফার্স্ট কে আটকায়।

অমিয় মেস বদলাইল। পাছে রঙ্গিলার চিঠি আসিয়া আবার অযথা বিরক্ত করে। পাছে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হয়।

কোনোরকমে পৃষ্ঠা ভরাইয়া অমিয় পরীক্ষা দিয়া উঠিল। সাতুই এপ্রিল। রঙ্গিলা হয়তো তাহারই আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

দিন দুই ধরিয়া অমিয় কেনাকাটা করিয়া বাক্স-পত্র গুছাইয়া ফেলিল। সে এ বার মান্দ্রাজের দিকে বেড়াইতে যাইবে ভাবিতেছে। এখন আর বাড়ি নয়, বাঙলা-দেশ নয়, অনেক—অনেক দূরে। দরকার হইলে সেখান হইতে আবার অন্য কোথাও। কিছুই ঠিক-ঠিকানা নাই, যেই দিকে দু'চক্ষু যায়। সে পুরুষ—তাহার ভয় কী! পায়ের নিচে দিগন্ত পর্যন্ত তাহার পথ।

ভাগ্যিস মাসখানেক আগে সেইখান হইতে মেসোমশাই বদ্‌লি হইয়া গিয়াছেন। আর, থাকিলেই বা কী, অমন আবদারের কথা কে কবে বিশ্বাস করিত। হাকিম মানুষ, সাক্ষী ছাড়া এক পা চলিতে চাহিতেন না। প্রমাণ কী, সাক্ষী কোথায়! মনগড়া মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

সন্ধ্যার দিকে ট্রেন—দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অমিয় খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। একটা জায়গায় আসিয়া তাহার চোখের আর পলক পড়িল না।

নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র : পোড়ামাটির। "একটি মেয়ে গতকল্য রাত্রে ষ্টেশনে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বসিয়া কলিকাতা মেইলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এঞ্জিন যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতেছে সেই সময়ে মেয়েটি হঠাৎ সজ্ঞানে তাহার সামনে লাফাইয়া পড়ে। এঞ্জিন থামিল বটে, কিন্তু সেই মেয়েটির দেহ তখন শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সকলের চোখের সামনে দিয়া মেয়েটি এই ভীষণ কাণ্ড করিয়া বসিল, অথচ, আশ্চর্য, সেখানকার কেহ তাহাকে চেনে না। অনেক অনুসন্ধান করিয়া মেয়েটির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে এখানকার আমিন বাবু মুকুন্দ গাঙুলির বিধবা মেয়ে শ্রীমতী রঙ্গিলা। সে যে আত্মহত্যা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার আঁচলের খুঁটে কলিকাতার একখানি থার্ড ক্লাশের টিকিট বাঁধা ছিল। তাহাকে টিকিট কিনিয়া দিয়াছে এই কথা ষ্টেশনের একজন কুলি স্বীকার করিল। অথচ, কলিকাতায়ই যদি সে যাইবে, তবে ঐ ভাবে মরিতে গেল কেন? আরো আশ্চর্য, কলিকাতায় মুকুন্দবাবু বা মেয়েটির কোনো আত্মীয়ই বর্তমান নাই।..."

মানচিত্রের এককোণে মান্দ্রাজ পড়িয়া রহিল, অমিয় সেই রাত্রেই রওনা হইল পোড়ামাটির দিকে। সে যে পুরুষ—সমস্ত স্নায়ু-শিরায় উচ্ছলিত উত্তপ্ত রক্তে সহসা সেই কথাই যেন উচ্চারিত হইয়া উঠিল। পুরুষ হইয়া সামান্য একটা ঘটনার মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইতে সে ভয় পাইল, ছি ছি, নিজের এই অক্ষমতার লজ্জার ক্ষমা কোথায়?

রঙ্গিলা শেষকালে তাহারই উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল আর-কি। সমস্ত সংসার তাহাকে ত্যাগ করিলেও, তাহার হয়তো আশা ছিল, অমিয় তাহাকে ফেলিতে পারিবে না! প্রেমের উপর এতই তাহার নির্ভর। কিন্তু মনে-মনে বিপুল রাজধানীর জনারণ্যে সে আর হয়তো পথ খুঁজিয়া পাইল না।

রঙ্গিলা—রঙ্গিলাকে তাহা হইলে অমিয়ই খুন করিয়াছে। রঙ্গিলার সেই অপমৃত্যু হইতে তাহার এই অপজীবন কত লজ্জাকর।

পোড়ামাটিতে যখন নামিল, খাঁ খাঁ করিতেছে রোদ। আস্তে-আস্তে, একটা-একটা করিয়া রাস্তা পার হইয়া অমিয় গ্রামে ঢুকিতে লাগিল। কান পাতা দায়—রঙ্গিলার কলঙ্ককথায় গ্রামের বাতাস আবিল হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য, রঙ্গিলা একাকিনী, তাহার দুর্নামের সঙ্গে আর কাহারও নাম জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাহার পূর্ববর্তী জীবনের উপরেও মৃত্যু আনিয়াছে অগাধ, অপরূপ স্তব্ধতা।

সাহস পাইয়া অমিয় মুকুন্দবাবুদের বাড়ির মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল। তাহার আবির্ভাবে শোকসমুদ্র হঠাৎ জুড়াইয়া আসিল--অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘরে এমন মাননীয় অতিথি আসিয়া হাজির : এত বড় নামজাদা হাকিমের শ্যালিকা-পুত্র।

রঙ্গিলার মা চোখের জল মুছিয়া নিভৃতে তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। সজল-কণ্ঠে কহিলেন,—আমি জানি হতভাগীকে তুমি কত ভালবাসতে বাবা, তাই তার মরণের খবর পেয়ে পাগলের মতো ছুটে এসেছ। জানি, একদিন না একদিন তুমি আসতে, ওকে তুমি ফেলতে পারতে না—

—কিন্তু, গলা খাঁকরাইয়া অমিয় জিজ্ঞাসা করিল : কেন ও অমন করে মরতে গেল, মাসিমা ?

—শ্বশুরবাড়ি থেকে নিতে এসেছিল। রঙ্গিলার মা কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন : যাচ্ছিল নবিনগর। চলতি ট্রেনে উঠতে যেতে কেমন পা গেল হড়কে, একেবারে চাকার তলায়।

অবাক হইয়া অমিয় রঙ্গিলার মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল : তবে খবরের কাগজে যে লিখেছে অন্য কথা।

—শত্রু, আমাদের শত্রুর কি আর অভাব আছে, বাবা ? গাঁয়ে এরি মধ্যে কতো কথা উঠে গেছে। তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই।

অমিয় চোখ নামাইয়া বলিল, শুনেছি, কিন্তু আমি তা এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।

রঙ্গিলার মা গদগদস্বরে বলিলেন, কি কবে করবে? তুমি যে আমার রঙ্গিলাকে চিনতে, বাবা।

বুক হালকা করিয়া অমিয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

রাত্রে ষ্টেশনে সে-ও কলিকাতার গাড়ির জন্য অপেক্ষা কবিতেছে। প্ল্যাটফর্মে বেশি ভিড় নাই। কেরোসিনের লণ্ঠন ক'টি মিটিমিটি করিতেছে। গাড়ি আজ কিছু লেইট।

হাঁটিতে-হাঁটিতে প্লাটফর্ম ছাড়াইয়া অনেক দূরে অমিয় লেভেল ক্রসিংএর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। থমথম করিতেছে অন্ধকার, সমস্ত ষ্টেশনটি সুষুপ্ত। ঝিঝির ডাকে সেই স্তব্ধতা যেন আরো নিবিড় আরো উচ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে আকাশে স্তরে স্তরে বিন্দু-বিন্দু তাবা জ্বলিতেছে। সেই তারা ও অন্ধকারের দিকে চাহিয়া অমিয়র মনে হইল, রঙ্গিলা—রঙ্গিলা তাহাকে জীবনে কত ভালোবাসিয়াছিল। মরণেও সেই ভালোবাসাকে এক তিল মলিন করিয়া রাখে নাই।

আব সে কি না এত বড় কাপুরুষ সেই প্রেমের মর্যাদা রাখিতে পাবিল না, ববং নিজেকে নিবাপদ মনে করিয়া হালকা নিশ্বাস ফেলিল ও পেট ভবিযা ভাত খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ষ্টেশনে আসিয়াছে গাড়ি ধরিতে! তাহাব কী, পায়ের নিচে তাহার অবারিত পথ!

ছি ছি, রঙ্গিলাব মৃত্যুর হইতে তাহার এই মুক্তি কী জঘন্য, কী লজ্জাকব!

ঐ, লাইনেব বাঁকেব মুখে ট্রেনের ঐ হেডলাইট দেখা যাইতেছে। এখন আর ষ্টেশনে ফিরিবার নাম করা যায় না। অমিয়ও এই ট্রেনের তলায় রঙ্গিলার মতই মাথা পাতিয়া দিবে।

শুধু সে জানে, রঙ্গিলা জানে, ঈশ্বর জানেন।

অমিয় লাইন ঘেঁষিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হয়ত রঙ্গিলা আকাশময় চক্ষু মেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

আছে। একটি মাত্র মুহূর্ত ঃ তাহার পরেই রঙ্গিলার সঙ্গে তাহার দেখা হইবে। সেই শীর্ণ শরীরের বৃন্তে তাহার উদ্ভাসিত নির্বোধ মুখখানি। গণনাতীত গ্রহ-তারকার মাঝে মাটির এই পৃথিবীই তাহাদের একান্ত আশ্রয় নয়। সে জানে, রঙ্গিলা জানে, ঈশ্বর জানেন।

এঞ্জিনের গর্জন ও চাকার সঙ্ঘর্ষ শোনা যাইতেছে। অভিভূতের মত অমিয় আরো এক পা আগাইয়া একেবারে লাইনের উপর আসিল। সমস্ত শরীর কঠিন, আতঙ্কে দুই চক্ষু সে বুজিয়া রহিয়াছে। আর দেরি নাই।

আশ্চর্য, ট্রেনটা লাইন ধরিয়া সামনে দিয়া কখন যে পার হইয়া গেল অমিয় কিছু খেয়াল করিতে পারিল না। একসময় শুধু চাহিয়া দেখিল একপাশে সে নিজে দাঁড়াইয়া আছে ও তাহার সামনে মোটা দুইটা লাইন।

চারদিক একেবারে ফাঁকা, ট্রেনের লাল ব্যাক্ লাইটটাও আর দেখা যায় না।

ম্লান, পীড়িত মুখে অমিয় ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিল। শুনিল কলিকাতার ট্রেন আবার সেই শেষরাত্রে।

আর্টিষ্ট

দুপুর বেলা দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শীতের রোদ পোহাচ্ছিলুম, শুনলুম আমার নামে কোত্থেকে এক টেলি এসেছে।

চিঠির মোড়ক না খোলা পর্যন্ত শিহরিত আঙুলের মুখে অর্ধোচ্চারিত প্রত্যাশার ভাষা, টেলির বেলায় সব সময়েই একটা মূঢ়, নিরবয়ব আতঙ্ক।

স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি। টেলি এসেছে সুদূর লামডিং থেকে। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি। চুনী—আমাদের চুনী আসামের জঙ্গলে মাত্র দশ ঘণ্টার ম্যালেরিয়ায় অকস্মাৎ মারা গেছে।

হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলুম। শীতের আকাশে কোথাও যেন আর এক ফোঁটা রোদ নেই। যেন একটা আর্দ্র, আহিম অন্ধকার আমার সমস্ত অস্তিত্বকে সহসা পিষে ধরেছে। অলস, ম্রিয়মান রোদে গা ভিজিয়ে খানিক আগে মনে-মনে কবিতার উড়ু-উড়ু মৃদু কয়েকটা লাইনে কল্পনার তা দিচ্ছিলুম, তারা স্তব্ধতার শূন্যে গেল হারিয়ে। চুনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি কবিতারও অকালমৃত্যু ঘটল।

কী যে করা যায় কিছু ঠিক করতে পারলুম না। চলে গেলুম রমেশের আপিসে। টাইপ-রাইটারের উপর একসঙ্গে তার দুই হাত চেপে ধরে বললুম,—ভীষণ দুঃসংবাদ।

—কী? রমেশের আঙুলগুলো আমার হাতের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে এল।

পকেট থেকে বের করে দেখালুম টেলি। আমাদের চুনী আর নেই।

—বলিস কী? রমেশ চেয়ারের পিঠে পিঠটা ছেড়ে দিলো: আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। এমন দুর্দান্ত ছিল ওর প্রাণশক্তি। হাতের মুঠোটা বাঘের থাবার মতো প্রচণ্ড। দুই চোখে ঝড়ের কাল দীপ্তি। গলায় যেন বাজ ডাকছে। তার মৃত্যুটা যেন সূর্যের আকস্মিক নির্বাপণের মতোই অসম্ভব।

—বরং আত্মহত্যা করলেও বিশ্বাস করতুম। শেষকালে ম্যালেরিয়ায় মরে যাওয়া? রমেশ ভয়ে হেসে উঠলো: কে করেছে টেলি? কে এই অমরেন্দ্র?

—লামডিং-এর কোনো বন্ধু বা আত্মীয় হবে হয়তো। যেখানে গিয়ে উঠেছিল। টেলিটা উলটে-পালটে নাড়াচড়া করতে-করতে বললুম: পরে চিঠি আসবে লিখেছে।

—কিন্তু লামডিং ও গেল কবে? এই সেদিন তো ওকে ম্যানাস্ক্রিপট বগলে করে কর্ণয়ালিশ ধরে যেতে দেখলুম।

—এই সেদিন, সেদিনও আমার কাছে এসেছিলো ওর একটা গল্পের ইংরিজি অনুবাদ করে দিতে পারি কি না। টাকার ভীষণ দরকার, অথচ মাথায় নাকি কিছু নতুন গল্প নেই। অনুবাদটা পেলে বোম্বাই না কোথাকাব কী কাগজ থেকে কিছু পেতে পারে সম্প্রতি। অথচ তার আগেই—

রমেশ দুই হাতে তার টাইপ-রাইটারের চাবি টিপতে লাগল। বললে,—টাকা, টাকার জন্যে শেষকালটা কেমন মরিয়া হয়ে গেছল। না হ'য়ে বা উপায় কী! কত বললুম কোথাও একটা অপিসে-টাপিসে ঢুকে পড়্—সাহিত্য করে কিছু হবে না। কে শোনে কার কথা! কী গোঁ, কী সতীত্ব, মরবে অথচ ধর্মভ্রষ্ট হবে না। যাক, রমেশ আবার চেয়ারে হেলান দিল: ভাগ্যিস বিয়ে করে রেখে যায় নি।

—কিন্তু সমস্যাটা তাতে বিশেষ প্রাঞ্জল হয়েছে বলে মনে হয় না। বললুম, বিধবা মা, তিনটি ছোট বোন, বড়োটির প্রায় বিয়ের বয়েস, এক দাদা আছেন—ট্র্যাম-য়্যাক্সিডেণ্টে আজ বছর দুই ধরে

প্যারালিটিক, বিছানায় শোয়া—তারো আছে ক'টি ছেলে-পুলে, সমস্ত সংসার ছিল চুনীর মাথার উপর। সমস্ত সংসারে শুধু ওই ছিল রোজগেরে—লিখে-টিখে যা পেত এদিক-ওদিক। এখন কী যে উপায় হবে কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

রমেশ বললে,—বাড়িতে জানে ?

—কী করে জানবো ? বোধহয় নয়। বোধহয় আমাকেই গিয়ে বলতে হবে। আপাদমস্তক শিউরে উঠলুম : তুইও আমার সঙ্গে যাবি, রমেশ।

—কিন্তু আগে খোঁজ নেয়া দরকার। অমরেন্দ্র না-কার আগে সবিস্তারে চিঠি আসুক। কোনো শত্রুর কারসাজি নয় তো ? রমেশ চেয়ার থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল : আমি যে কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না, চুনী আর নেই—আমাদের সেই চুনী।

বিশ্বাস করা এমনিই শক্ত। টেলির আঁকাবাঁকা নীলচে ক'টি অক্ষর ছাড়া আর কোথাও এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। স্পষ্ট দিবালোকে পৃথিবী তার অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বললুম,—মানুষের মৃত্যুটা সবসময়েই ভীষণ সত্যবাদী। তার আকস্মিকতাতেই সে বেশি স্পষ্ট, বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এখন কী করা যায় ? ওর মা'র কাছে গিয়ে কী করে এই খবর দেব ?

—দাঁড়া, ভেবে দেখি। আমিও তোর সঙ্গে যাব। রমেশ আমার হাত ধরে টান মারলো : চল্ টিফিন্-রুমে। দু' কাপ আগে চা খেয়ে নিই। গলাটা আমার শুকিয়ে আসছে।

রমেশকে নিয়ে সন্ধ্যাসন্ধিতে চুনীদের বাড়ি গেলুম। নোংরা, অন্ধ একটা গলির শেষ-প্রান্তে, তা-ও ভিতরের দিকে, দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট, নিচু একটা গর্ত। শীতের সন্ধ্যায় স্যাঁতস্যাঁত করছে। এ-বাড়ির বাতাস কোনোদিন যেন রোদের মুখ দেখে নি। অন্ধকারটা যেন কালো মস্ত একটা মরা পাখির মতো তার ভারি পাখায় ঘর জুড়ে পড়ে আছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়াতেই চোখ একটু সজুত হয়ে এল।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ এল : কে ?

—আমি, আমি প্রসাদ। আর সঙ্গে এই আমার একটি বন্ধু।

কাঁথার তলা থেকে চুনীর মা উঠে এলেন। বয়সে যত নয়, দারিদ্র্যে গেছেন জীর্ণ হয়ে। বললেন,—এসো, এসো, তোমাদের কাছেই খবর পাঠাবো ভাবছিলুম। চুনী কোথায় গেছে বলতে পারো ?

শুকনো একটা ঢোক গিলে বললুম,—কেন, চুনী বাড়ি নেই ?

—কলকাতায়ই নেই। তিন দিন হল, গেল-বেস্পতিবার সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো, আর তার কোনো পাত্তাই নেই। তোমাদের সঙ্গে ওর দেখা হয় নি ?

—না তো। অনেক দিন দেখা নেই বলে আমরাই বরং ওর খোঁজ নিতে এসেছিলুম। কোথায় গেছে কিছুই বলে যায় নি ?

—সে ছেলে আবার বলবে! মা অবহনীয় দুর্বলতায় মেঝের উপর বসে পড়লেন : যা মুখে এল তাই না আমাকে বলে পাগলটার মতো বেরিয়ে গেল। তারপর একটিবারের জন্যেও এ-মুখো হবার নাম নেই। সামান্য একটা চিঠি পর্যন্তও নয়। মা হঠাৎ কান্নার অসহায়তায় ফুঁপিয়ে উঠলেন : আমি তো তোমাদের দেখে ভাবছিলুম তোমরা আমার চুনীর কিছু খবর নিয়ে এসেছ।

গলাকে যথাসম্ভব তরল রাখবার চেষ্টা করলুম। বললুম,—আমার সঙ্গে কম-সে-কম প্রায় দুই হপ্তা দেখা নেই। নতুন এক কাগজ বেরুচ্ছে তাই ওর একটা লেখা চাইতে এসেছিলুম। তা—ও হঠাৎ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল কেন ?

—আর বোলো না। মার কান্না এবার শব্দে প্রতিহত হতে লাগল : বাড়িওলা সেদিন বাড়ি এসে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল, ওকে বলেছিলাম তার একটা প্রতিবিধান করতে। ও

ক্ষেপে উঠে বললে, বাড়িওলাকে ও এখুনি গিয়ে খুন করে আসবে। আমি টিটকিরি করে বলেছিলুম, ওর ন্যায্য টাকা দিতে পারিস না, আবার মুখ করিস কার ওপর? করবেই তো তাকে অপমান যে ঠাট করে মাসের পর মাস পরের বাড়িতে থাকবে অথচ ভাড়ার টাকা গুনতে পারবে না। তার আবার কিসের মা, কিসের কী? এই না বলা, আর ছেলের সমস্ত রক্ত গেল মাথায় উঠে। দু'হাতে জিনিস-পত্র ভেঙে চুরে ছত্রখান করে দিয়ে যা মুখে এল তাই আমাকে বলতে-বলতে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

গলায় হাসির আমেজ এনে বললুম,—কী বললে?

—সে আমি মুখে বলতে পারব না। মুখে ওর কোনোদিন কিছু বাধে নাকি?

—না, বলুন, আমাদের বলতে কী বাধা?

মা দুই হাঁটুতে মুখ ঢাকলেন: বললে, 'পারব না, পারব না আমি এই গুষ্টি গেলাতে। আমি কে, আমার কী, আমি কেন তোমাদের সবাইকে খাওয়াতে যাব? আমি একা, আমাকে সবাই মিলে তোমরা বাঁচতে না দাও, আমার মরণ তোমরা কী করে বন্ধ করতে পারবে? আমি মরবো, আমি মরবো, মা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলেন: যা মুখে এল তাই বলতে-বলতে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। ভাতের থালাটা পর্যন্ত ছুঁলো না।

ঘরের মৃত, ঠাণ্ডা অন্ধকার মুখের উপর প্রেতায়িত নিশ্বাস ফেললে। অন্ধকারে যেন অস্তিত্বের কোনো সীমা খুঁজে পেলুম না।

পিছন থেকে রমেশ বলে উঠল: একেবারে ছেলেমানুষ।

—এমনি ছেলেমানষি আরো কতোবার করেছে, রাগারাগি করে কতোদিন গেছে ঘর থেকে বেরিয়ে, আবার একটি দিন পুরো যেতে-না-যেতেই কোত্থেকে নিয়ে এসেছে টাকা যোগাড় করে—এমন করে একসঙ্গে এতোদিন আমাদের ফেলে রাখে নি। কী যে মুশকিলে পড়েছি, প্রসাদ, কী বলব? হাঁড়িতে একটা কুটো পর্যন্ত

নেই—ছেলেপুলেগুলো কাল থেকে ঠায় উপোস করে আছে। তোমরা একটু খোঁজ করে রাগ ভাঙিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারো ? ও নিজেই বা এতোদিন কী করে থাকতে পারছে চুপ করে ? ও জানে না আমাদের অবস্থা ? ও জানে না ও ছাড়া আমাদের কী গতি হবে ?

রমেশ জিগগেস করলে: লামডিংএ অমরেন্দ্র বলে আপনাদের কেউ আছে জানেন ?

—অমরেন্দ্র ? মা চমকে উঠলেন: কেন ? অমরেন্দ্র তো আমার দুর সম্পর্কের বোনপো হয়। লামডিংএ তার মস্ত কাঠের কারবার। কেন, তার কী হলো ?

—না, কিছু হয়নি। একটা উড়ো খবর শুনেছিলুম চুনী নাকি লামডিংএ গেছে সেই অমরেন্দ্রের কাছে।

—পাগল। তার হবে আবার সেই সুমতি! অমরেন্দ্র তার কারবারে ওকে নেবার জন্যে কতো ঝোলাঝুলি, পেরেছে ওকে বাগ মানাতে ? ব্যবসা বা চাকরি ওর দু' চক্ষের বিষ। ওর তপস্যা হচ্ছে সাহিত্য, খেতে না পাক, গুষ্টিসুদ্ধু মরুক সবাই মিলে, তবু ও ছাড়বে না ওর নেশা। ওটা ওর কাছে ঠিক ধর্মের মতো। বলে, যার যা কাজ মা, যার যা ব্রত। বলে, তুমি বলতে পারো আগুনকে তুমি পোড়াতে পারবে না, দিতে পারবে না আলো, হতে পারবে না লাল ? তেমনি মা আমি। আমার যা করবার তাই আমি করব, তাই আমি করব আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ও যাবে লামডিং, অমরেন্দ্রের কারবারে! উদ্বেগে অস্থির হয়ে মা আবার উঠে দাঁড়ালেন: তা হ'লে তো অমরেন্দ্রই আমাকে আহ্লাদে একেবারে টেলি করে খবর দিতো। লামডিংএ যাবে বলে তোমাদের কাছে ও কিছু বলেছিল নাকি ?

—না, বলে নি ঠিক, তবে হ্যাঁ, শুনেছিলুম যেন কোথায়, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। রমেশ হাঁপিয়ে উঠল।

মা আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন : যে করে পারো ওর একটা খবর এনে দাও আমাকে। আমি এমনি করে যে আর পাচ্ছি না। এতদিন ধরে রাগ করে থাকবার ছেলে তো ও নয়। ও যে মা'র দুঃখ ভীষণ বুঝতো, সবায়ের দুঃখ।

বললুম,—না, নিশ্চিন্ত থাকুন, খবর এনে দেবো ঠিক। কোথায় আবার যাবে?

রমেশ তার মনিব্যাগ থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বার করল। আমি তো অবাক।

রমেশ বললে,—এ সামান্য ক'টা টাকা আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। ক'টা দিন চালান যতদিন না চুনীর খবর পাওয়া যায়।

মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে গেলেন : না, না, তা কি হয়? চুনী জানলে মনে করবে কী? আবার ক্ষেপে যাবে, আবার যাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে। ওকে তোমরা চেনো না।

—না, এটা ওকে ওর গল্পের জন্যে অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছি মাত্র, ওর গল্প আমরা চাই-ই। রমেশ নোট দুটো কোনো রকমে মা'র হাতে গুঁজে দিল।

খবরটা কিছুতেই ভাঙতে পারলুম না। দু' দিন ধরে সমস্ত পরিবার ঠায় উপোস করে আছে।

কিন্তু রমেশের ব্যবহার সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য করেছে। বরং কঞ্জুস বলেই তার একটু অখ্যাতি ছিল, বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে আঙুলের ফাঁকে একটি পয়সাও তার গলতো না। সে কিনা অনায়াসে কুড়ি-কুড়িটে টাকা বার করে দিলে। চুনীর ভাগ্য বলতে হবে! কিন্তু হায়, বন্ধুর এই মহানুভবতা দেখবার জন্যে আজ সে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে বা বেঁচে থাকতে অবিশ্যি তার উপর আমরা এমন মুক্তহস্ত হতে পারতুম না।

অমরেন্দ্রের চিঠির জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বন্ধুদের মধ্যে একবার ঠিক হয়েছিল লামডিংএ কাউকে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সেই

দিনই দুপুরে অমরেন্দ্রের চিঠি এসে হাজির। সমস্ত ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছে।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার আগে প্রায় সাড়ে ন'টার সময় তার জ্বর আসে—দেখতে দেখতে একশো পাঁচ, ছয়, সাত উঠে এল মাথায়। যাকে বলে ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্‌ ম্যালেরিয়া। চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। ডাক্তার, ইন্‌জেক্‌শান, আইস্‌ব্যাগ—ষ্টেশন থেকে দু'মণ বরফ পর্যন্ত আনানো হয়েছিল। লোকজন সেবা-শুশ্রূষা—যতদূর হ'তে পারে। তবু কিছুতেই কিছু হলো না। জ্বর নেমে গেল প্রায় চারটের কাছাকাছি, সঙ্গে-সঙ্গে সব গেল নিবে, জল হ'য়ে। দশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।

তারপর চিঠিতে খবরের কাগজের ভাষায় অমরেন্দ্র দীর্ঘ এক বিলাপ জুড়ে দিয়েছে। তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই, বাঙলা দেশের আকাশ থেকে একটি উদীয়মান, উজ্জ্বলন্ত নক্ষত্র হঠাৎ খসে পড়ল। তার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্যে তার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের অবহিত হওয়া উচিত। বাঙলা সাহিত্যের যা ক্ষতি হল—সে আরেক শোকাবহ, দীর্ঘ বক্তৃতা। অমরেন্দ্রের কারবার এখন ভারি মন্দা, চারদিক দেখতে-শুনতে হচ্ছে, তাই এই দুঃসময়ে মাসিমার সঙ্গে এসে সে দেখা করতে পারছে না। তবে চুনীর জন্যে কোনো মেমোরিয়্যাল ফাণ্ড তৈরি হলে সে একুনে একশো টাকা দিতে রাজি আছে।

মনে-মনে হাসলুম। চুনী আজ নেহাৎ মরে গেছে বলেই, তোমার ব্যবসার মন্দায়মান অবস্থা সত্ত্বেও, তুমি এক কথায় একশো টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলে। কিন্তু যতদিন ও বেঁচে ছিল, ততদিন ভুলেও হয়তো একখানা পোষ্টকার্ড খরচ করে ওর খবর নাওনি। বাঙলা-দেশের আকাশ থেকে একটা তারা-ই খসেছে বটে। সে-খবরটাই শুধু পেলে, কিন্তু কখন সেটা উঠেছিল বলতে পারো?

চুনীলালের জীবনের সমস্ত ছবিটি আমার মনে পড়ল। সে সেই জাতের সাহিত্যিক ছিল না যারা পয়সার জন্যে জনসাধারণের মুখ চেয়ে সাহিত্যকে জার্নালিজমের পর্যায়ে নিয়ে আসে। তাতে তার নিজের তৃপ্তি কী হত ছাই কে জানে, পয়সা হত না। এ-পর্যন্ত কেঁদে-ককিয়ে বই লিখেছে সে মোটে পাঁচখানা—তাও প্রকাশকের ফরমায়েসে নয়, নিজের তাগিদে, বই ছাপাতে তার তাই বেগ পেতে হত ভীষণ, জনসাধারণের কথা না বলে সে নিজের কথা বলবে—এই আস্পর্ধার জন্যে তাকে দাম বলে যা নিতে হত সেটাতে তার কাগজ ও কালির দাম উঠে আসত কিনা সন্দেহ। অথচ সে আমার মতো শীতের রোদে ইজিচেয়ারে আধখানা শুয়ে কবিতায় গলে যেতে বসেনি, নেমে এসেছিল সে গদ্যের রূঢ় বন্ধুরতায়। তবু কেন যে সে বেশি লিখছে না, লেখাটাকে বুদ্ধিমানের মতো করে তুলছে না একটা অর্থোপার্জনের বিদ্যা, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য ছিল। জিগগেস করলে বলত: কী লিখব, কাদের জন্যে লিখব? মূর্খ পাবলিকের বুদ্ধির সমতলতায় সে নেমে আসতে পারে নি, তাই তার উপর ভাড়াটে ছুটো সমালোচকরা প্রসন্ন ছিল না। আর চুনীলাল লিখেই খালাস, একবার চেয়েও দেখত না বইয়ের সম্পর্কে আর তার কোনো কর্তব্য থাকতে পারে কিনা। বইয়ের কাটতির জন্যে বিজ্ঞাপন লেখার কসরৎও যে সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ, সে বিষয়ে তার অজ্ঞান ছিল অভ্রভেদী। ঘরে-বাইরে এখানে-ওখানে নিজের বইয়ের ঢাক পেটাবার সূক্ষ্ম কৌশলটা এতদিনেও সে আয়ত্ত করতে পারেনি। বন্ধু-বান্ধব ধরে কী করে সভা-সমিতি ডাকানো যায়, কী করে আদায় করা যায় প্রোফেসরদের সার্টিফিকেট, কারু কোনো অসংলগ্ন মৌখিক উক্তিকে কেমন ছলনা করে ছাপার অক্ষরে টেনে আনা যায়—সাহিত্য-ব্যবসায়ের এ সব প্রাথমিক আবালবৃদ্ধজ্ঞেয় নীতি সম্বন্ধে সে ছিল একেবারে নিশ্ছিদ্র। তবুও তাকে কিনা আসতে হয়েছিল এই

সাহিত্যে—এই সাহিত্যিক উপজীবিকায়। নিয়তির সামনে তার পুরুষকার টিকতে পারল না।

চুনীর মৃত্যুর খবরটা পরদিন দৈনিক কাগজে সমারোহে ছাপা হয়ে গেল। আজ আর কেউ চুনীকে প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত নয়ঃ একজন তরুণ বাঙালি সাহিত্যিক অকালে তিরোধান করল খবরের কাগজের দপ্তরে সেটা একটা মস্ত খবর। তার দাম আছে। তার জীবনের না থাক, মৃত্যুর তো বটেই। কোনো-কোনো কাগজ তার উপরে প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত লিখেছে। বাঙলা-ভাষার ক্ষতি কষতে গিয়ে শোকের উৎসাহে বাঙলা ভাষাকে আর তারা কেউ আস্ত রাখে নি।

দৈনিক কাগজ নিবে গিয়ে ক্রমে মাসিক-কাগজের দিন এল। নানা জায়গা থেকে আমার কাছে চিঠি আসতে লাগল চুনীলালের কোনো অপ্রকাশিত লেখা বা ফোটো এনে দিতে পারি কি না। ওদের বাড়ির সেই অন্ধকার গর্ত হাতড়াতে-হাতড়াতে কয়েকটা লেখা বার হলঃ খুচরো তিনটে গল্প, আর ছেঁড়া-খোঁড়া একটা নাটিকা। মা বাক্স থেকে তার কিশোর-বয়সের সুকুমার একখানি ছবি খুলে দিলেন। চুনীলালের শেষ সম্পত্তিগুলি নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

সম্পাদক দামিনীভূষণ চুনীর জীবদ্দশায় তার উপর প্রায় খড়গহস্ত ছিলেন। কিন্তু আজ মৃত্যু তার স্মৃতির উপর অপরিম্লান একটি মহিমা এনে দিয়েছে। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখাচ্ছে তাকে আজ যথার্থ অনুপাতে। আজ তাকে মূল্য দিতে কারু কোনো লোকসান নেই, কেননা সে মূল্য সে আর নিজ হাতে নিতে আসছে না। তাকে প্রশংসা করতে আজ আর কিসের লজ্জা, কিসের ভয়, যখন সে নিঃশেষে মরে গেছে। মৃত্যুর মতো নিশ্চিন্ত আর আছে কি।

পৃষ্ঠায় যে-গল্পটি সব চেয়ে বড়ো দামিনীভূষণ সেটি গ্রহণ করলেন। একবার পড়ে পর্যন্ত দেখলেন না। তার দরকার ছিল না।

চুনীলালের লেখাটা তাঁর কাগজে আজ একটা মস্ত বিজ্ঞাপন—সেটা তিনি ব্যবসার চোখে সহজেই ধরতে পেরেছেন। আজ তার লেখা ছাপায় চুনীলালের দরকার নেই—দরকার দামিনীভূষণের। বলা বাহুল্য, প্রায় অর্থনৈতিক নিয়মেই দামটা একটু বেশি চাইলুম। দামিনীভূষণ এক কথাতেই রাজি, আমার মতের জন্যে অপেক্ষা না করে সটান একটা পঞ্চাশ টাকার চেক কেটে দিলেন। বললেন: ওঁর বিপন্ন, দরিদ্র পরিবারের কথা ভেবেই সংখ্যাটা একটু ভদ্র করলুম।

দামিনীভূষণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চারপাশের কৃপাজীবীর দলও মমতায় দ্রবীভূত হয়ে গেল। আলোক গদ্গদ হ'য়ে বললে—কিন্তু এ-টাকায় বড়ো জোর একমাস চলতে পারে। তারপর? দামিনীবাবুর মতো স্বজনবৎসল লোক তো আর বেশি নেই বাঙলা-দেশে।

বললুম—না, আমরা একটা চুনীলাল-মেমোরিয়াল ফাণ্ড খুলব ভাবছি।

—খুলুন, দামিনীভূষণ সহসা সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারলেন: একশো বার খোলা উচিত। এই নিন, আমিই দিচ্ছি প্রথম চাঁদা। বলে বুকপকেট থেকে মনি-ব্যাগ খুলে আমার দিকে দশটাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরলেন।

কৃপাজীবীদের কেউ-কেউ করুণ, মৃত্যুম্লান চোখে দামিনীভূষণের দিকে চেয়ে রইল। কেউ-কেউ উল্লাসে ঢলে পড়ে বললে: কী উদার, কী মহান।

চুনীলালের মৃত্যুতে দামিনীভূষণ উদারতার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েছেন বটে। ভাগ্যিস সে মরেছিল, নইলে তাঁকে এমন মহৎ বলে হয়তো আমরা দেখতে পেতুম না।

দামিনীভূষণ আর্দ্র গলায় বললেন,—আমি শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখলুম, চুনীবাবুর লেখা এমন কিছু নিন্দনীয় ছিল না। শুধু কাগজের পলিসির জন্যেই তাঁকে রাইট-য়্যাণ্ড-লেফট গাল দিতে

হয়েছে। মানুষ না মরলে তাকে আমরা বুঝতে শিখি না কখনো। কী বলো হে রাজেন ?

—আমিও তোমাকে এতদিন এই কথাই বলব-বলব করছিলুম। বাবরি চুলে উদাস একটি ছোকরা গুনগুনিয়ে বলে উঠল।

চুনী নিতান্ত আর বেঁচে নেই বলেই আজ তার এত সৌভাগ্য।

বাকি লেখা দুটোও উঁচু দামে অতি সহজেই বেচে এলুম। এই মহড়ায় থিয়েটার খুব ভালো জমবে মনে করে তার সেই নাটিকাটিও পেশাদার এক থিয়েটার-পার্টি কিনে নিল।

আশ্চর্য, স্বপ্নেও কেউ যা কখনো ভাবতে পারিনি। আজ আর তার সমালোচনার কথা উঠতেও পারে না, বেরুতে লাগল কেবল উচ্ছ্বসিত, উলঙ্গ প্রশংসা। দামিনীভূষণের রাজেন সংস্কৃতবহুল গম্ভীর বাঙলায় "সাহিত্যে চুনীলালের বিদ্রোহ" সম্বন্ধে জাঁকালো, প্রকাণ্ড এক প্রবন্ধ বার করলে। (পৃষ্ঠা গুনে সে দাম পাবে অবিশ্যি) তার দেখাদেখি, এটাই নতুনতম ফ্যাশান ভেবে, আর-আর কাগজও সুর মেলাল। চুনীর বইগুলি কাটতে লাগল প্রায় হু-হু শব্দে, ছ' মাসে বইটার প্রায় এডিশন হয়! যে-বইটার সে কপি-রাইট বেচে দিয়েছিল, তার বিক্রয়াধিক্য দেখে প্রকাশক আপনা থেকেই দয়াপরবশ হয়ে কিছু মোটা টাকা চুনীর মায়ের নামে ধরে দিলেন। নাটিকাটাও সেই সঙ্গে জমজমাট হয়ে উঠল।

আজ চুনীলাল নেই। কিন্তু তার বাড়ির অবস্থা এ ক'মাসে বেশ শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে।. বেঁচে থাকলে শত চেষ্টা, শত সংগ্রাম করেও এ-বাড়ির একখানা ইঁট সে খসাতে পারত না। কিন্তু তার তিরোধানের কল্যাণে সবাই উঠে এসেছে এখন ভালো পাড়ায়, ফাঁকা, রোদালো বাড়িতে। চুনীলালের মৃত্যু সমস্ত পরিবারের পক্ষে প্রসন্ন একটি আশীর্বাদ।

আমিই তার টাকা-পয়সার তদারক করছি—মেমোরিয়াল ফাণ্ডটাও আমারই হাতে। বর্ষার নদীর মতো ক্রমশ তা কেবল

কেঁপেই চলেছে—প্রতি সপ্তাহে খবরের কাগজে জমার তালিকাটা দেশের সামনে পেশ করছি। আজ চুনীলালের অনুরাগী ভক্তের আর লেখাজোখা নেই, দূর মফস্বল থেকে অপরিচিততম পাঠক পর্যন্ত তার সাধ্যাতীত দিচ্ছে পাঠিয়ে। যতদিন চুনীলাল বেঁচে ছিল কেউ তাকে চিনত না, আজ তার মৃত্যু সমস্ত দেশের কাছে একটা অনপচেয় ঐশ্বর্য। জীবনে সে ছিল নির্বাক, নির্বাপিত, কিন্তু মৃত্যুতে সে আজ মুখর, অন্ধকারে সে আজ দীপ্যমান। মৃত্যুই আজ তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন, শ্রেষ্ঠ রচনা।

তার জন্যে আর আমরা কেউ শোক করছি না।

ফাণ্ডের টাকাটা দিয়ে চুনীলালের নামে একটা লাইব্রেরি স্থাপনার জল্পনা চলছিল। এই বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে দেশবাসীর একটা মত আহ্বান করেছিলুম, সবাই প্রায় রাজি দেখা গেল। কেউ-কেউ শুধু বললে,—সঙ্গে চুনীলালের একটি প্রস্তরমূর্তিও স্থাপিত করা হোক।

কমিটি থেকে তাই পাশ করিয়ে নিয়ে নিচে একা ঘরে হিসেবের খসড়ার উপব অন্যমনস্কের মতো চোখ বোলাচ্ছিলুম, হঠাৎ দরজার কড়াটা যেন হাওয়ায় নড়ে উঠল।

রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। পাড়াটা নিঝুম। আলো নিবিয়ে উপরে শুতে যাচ্ছি, দরজার উপর আবাব কার ভারি হাতের শব্দ হল।

বললুম—খোলা আছে। ধাক্কা দিন।

দরজাটা সজোরে দু' ফাঁক হয়ে খুলে গেল।

চমকে আর্তকণ্ঠে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলুম। মুহূর্তে সমস্ত শরীর শীতের পাতার মতো শুকিয়ে এল। চারদিক থেকে দেয়াল-গুলি যেন হেঁটে-হেঁটে সরে এসে আমাকে চেপে ধরেছে। পায়ের নিচে মেঝেটা আর খুঁজে পাচ্ছি না।

লোকটা শব্দ করে চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসল। হাসিমুখে, প্রফুল্ল, পরিচিত স্বাভাবিকতায় বললে,—অতো ভয় পাচ্ছিস কেন? চিনতে পাচ্ছিস না আমাকে?

চাপা গলায় আবার একটা চীৎকার করতে যাচ্ছিলুম, চুনীলাল তেমনি তার প্রবল উচ্ছ্বসিত পৌরুষে অজস্র হেসে উঠল। বললুম : তুই, তুই কোত্থেকে ?

—স্বর্গ থেকে বললে বিশেষ নিশ্চিন্ত হবি না নিশ্চয়ই। চুনীলাল কোটের বোতামগুলি খুলতে-খুলতে বললে,—আপাতত লামডিং থেকেই আসছি। কত পেলি ? জমলো কত আমার ফাণ্ডে ?

তার মুখের উপর রুখে উঠলুম : লামডিং থেকে আসছিস মানে ?

—হ্যাঁ, ফাণ্ডের টাকাটা নিয়ে যেতে এসেছি। বেশ একটা ডিসেণ্ট সংখ্যা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বলে চুনীলাল আবার শূন্যতা কাঁপিয়ে হেসে উঠল : বেশ পাবলিসিটি করেছিস, প্রসাদ। আমিও তাই আশা করছিলুম। ব্যবসায় বেশ মাথা খুলেছে দেখছি।

চেয়ারের পিঠে ভেঙে পড়ে আবার তাব সেই পরিতৃপ্ত আলস্য।

তার হাতটা মুঠোর মধ্যে শক্ত কবে চেপে ধরলুম। হাড়ময় নীরক্ত হাত নয়, দস্তুবমতো মাংসল, সুস্থ, নধর। বললুম : এ কী ভীষণ কথা ? তুই না মরে গেছিস ?

—মবেই গেছি তো নিঃশেষে মরে গেছি। চুনীলাল পরিষ্কার, প্রখর দাঁতে আবার হেসে উঠল : আমি তো আর সাহিত্যিক নই, আমি এখন অমরেন্দ্রেব কাঠের কারবারে।

এক রাতি

রাত এখন ক'টা ? গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে একটা মোটর চলে গেল পশ্চিমে। যত রাতেই হোক, দাঁড়াও এসে জানালার সামনে, দেখতে পাবে একটা মোটর সাঁ করে বেরিয়ে গেল। কোথায় যায়, কোথায় থামে কে জানে।

ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে। শীতের শেষে বসন্তের বৃষ্টি। শীতকে মনে করিয়ে দেওয়ার বৃষ্টি। আকাশের করুণা। সবাই ঘুমুবে শান্ত হয়ে। বৃষ্টির শব্দে পায়ের শব্দটি শোনা যাবে না।

যদি আসে নিশ্চয়ই খালি পায়ে আসবে। অনেক রাতে হঠাৎ-ওঠা চাঁদের হাসিটির মত আসবে। কিংবা গহন অরণ্যে ভয়-পাওয়া কৃষ্ণসার হরিণীর মত।

কিন্তু আসবে কি ? কেউ আসে ?

আজ যদি না আসে তবে আর আসবে কবে ? এমন শুভরাত্রি বিধাতা ফরমায়েস দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। জামাইবাবুর মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দিদি আর জামাইবাবু চলে গিয়েছেন কলকাতা। পরাশরবাবু হাসপাতালে। তার স্ত্রী কাছাকাছি কাকার বাড়িতে। উপরে শুধু ও আর ওর মা। মাকে একটু ফাঁকি দিতে পারবে না তো মেয়ে হয়েছে কেন ?

প্রথম দিনের ঝগড়ার কথাটাই মনে পড়ছে ভবদেবের।

একটা গাছ এসে পড়েছিল ভবদেবদের এলেকায়। গোলাপ গাছ। আর ধরবি তো ধর সেই গাছেই ফুল ধরল।

সেই ফুলই নৃশংস হাতে ছিঁড়ে নিয়েছিল ক্ষণিকা। ভেবেছিল কেউ দেখতে পাবে না বুঝি। তাড়াতাড়িতে ছিঁড়তে গিয়ে নরম ডালটাকে জখম করে ছেড়েছে।

'ও কি, ও ফুল ছিঁড়লেন যে?' চকিতে সামনে এসে হুমকে উঠেছিল ভবদেব।

'এ গাছ আপনাদের ভাড়া দেওয়া হয়নি।' রূঢ় উপেক্ষায় পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল ক্ষণিকা।

'সে কি কথা! ঘরের সামনের এ ফালিজমিটুকু যদি আমাদের, জমির উপরকার এ ফুল-গাছও আমাদের। একেবারে আমার ঘর ঘেঁষে এই গাছ—হাত বাড়ালেই ধরা যায় রীতিমত।'

কি অপূর্ব যুক্তি। মনে-মনে হেসেছিল নিশ্চয়ই ক্ষণিকা। যেহেতু হাত বাড়ালেই ধরা যায় সেহেতু আমার অধিকার! বাঁকা ভুরু সঙ্কুচিত করে বলেছিল ক্ষণিকা, 'কিন্তু এগাছ আপনারা পোঁতেননি, আমরা পুঁতেছি—'

'আপনারা তো আরো অনেক পুঁতেছেন। বাগান সাজিয়ে বিলিতি তারের বেড়া দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ফুল হয়েছে একটাতেও? গাছ পোঁতা আর তাতে ফুল ফোটানো এক কথা নয়। পুকুর অনেকেই কাটে কিন্তু পুণ্য না থাকলে তাতে জল হয় না।'

কি অপূর্ব উপমা! উপেক্ষার ভঙ্গিতে আবার পিঠ ঘুরিয়েছিল ক্ষণিকা। দীর্ঘবৃন্ত ফুলটা খোঁপায় গুঁজতে-গুঁজতে বলেছিল, 'ফুল যদি ফুটে থাকে তবে ভাড়াটেদের পুণ্যে ফোটেনি, যাদের বাড়ি তাদের পুণ্যেই ফুটেছে।'

'কিন্তু ছিঁড়ে নেবার সময় তো পুণ্যবানের ভঙ্গি বিশেষ ছিল না হাতে-চোখে। যেন কেউ দেখতে না পায় এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে চোরের মত পালিয়ে যাওয়ার মতলব।'

'নিজের পাঁঠা যে ভাবে খুশি সে ভাবে কাটব তাতে অন্য লোকের কি।'

'কী হয়েছে রে ক্ষণু?' আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল সুনয়নী।

এক মুহূর্ত দেরি হয়নি বুঝে নিতে। কতদিন বহু যত্নে ভুই

চোখের ভালোবাসা দিয়ে যে ফুলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ভবদেব, তা আর নেই। মোচড় খেয়ে ডালটাও হেলে পড়েছে। কতবার বলেছে সুনয়নী, ফুলটিকে তুলে এনে ফুলদানিতে রেখে দে। উত্তরে বলেছে, তেমন কেউ যদি থাকত দেবার মত তার জন্যে তুলে আনতুম। তেমন যখন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তখন গাছের ফুল গাছেই থাক।

'আমিই ফুলটা ছিঁড়েছি দিদি।' পিঠ ঘুরিয়ে খোঁপাটা দেখিয়েছিল ক্ষণিকা। ঘষা-ঘষা ওড়া-ওড়া চুলের শুকনো খোঁপার মধ্যে টাটকা একটা রক্ত গোলাপ।

'বা, চমৎকার।' গাল ভরে হেসে উঠেছিল সুনয়নী। বলেছিল, 'কেশবতী রাজকন্যের মাথায় উঠেছে, ফুলের আর কি চাই।'

সুন্দর করে হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বিজয়িনীর ভঙ্গিতে মাথা উদ্ধত করে চলে গিয়েছিল সমুখ থেকে।

কোথায় যাবে! অহঙ্কারে মাথা চাড়া দিয়ে চলতে গেলে আলতো খোঁপায় থাকবে কেন গোলাপ! খসে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

যাক পড়ে। নেব না কুড়িয়ে। পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখব না।

সোজা চলে গিয়েছিল গরবিনী—সকালের রোদ্দুরে সারা গায়ে যৌবনের ঝলক দিয়ে।

ছিন্নবৃন্ত বিধ্বস্ত গোলাপটার দিকে তাকিয়ে ছিল ভবদেব। বিহ্বল বৃন্তাশ্রয় ছেড়ে মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকলেও কম সুন্দর নয় গোলাপ।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। এখনো ঘুমুতে যায়নি ভবদেব। চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। পরিপাটি করে বিছানা পাতা। একটিও ভাঁজ নেই, রেখা নেই। উচ্ছ্বসিত কোমলতায় প্রসারিত হয়ে আছে। সমস্ত ঘর অন্ধকার। খানিক আগে একটা মোমবাতি জ্বালিয়েছিল ভবদেব। পরে কি ভেবে নিবিয়ে দিয়েছে ফুঁ দিয়ে।

অন্ধকারেই আসুক পথ চিনে। আকাঙ্ক্ষার তাপ লেগে-লেগে অন্ধকারই তার মূর্তিতে দীপায়িত হোক।

কিন্তু সত্যি কি আসবে? বলে গেলেও আসা কি সম্ভব? আসা কি মুখের কথা?

এখনো বৃষ্টি চলেছে ঝিরঝির। এলোমেলো হাওয়া উঠেছে। দুদিকের দু দরজাই ভেজানো ছিল এতক্ষণ। হাওয়ায় শব্দ হতে পারে ভেবে ছিটকিনি লাগাল ভবদেব। কথা আছে, ঠেলে যদি বোঝে দরজা বন্ধ, আঙুলের টোকা মারবে। তার দরকার হবে না। এ অঞ্চলে চলে এলেই অনায়াসে বুঝতে পারবে ভবদেব। হাওয়ায় পাবে তার গায়ের গন্ধ, শুনবে তার শাড়ির খসখস।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে আলগোছে। মা আর মেয়ে এক ঘরে শোয়, হয়তো মা-ই এখনো আচ্ছন্ন হয়নি। অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ক্ষণিকা। প্রতীক্ষা করছে। এদিকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মোমবাতি।

নিয়তির পরিহাসের কথা কে না শুনেছে। হাতের পেয়ালা মুখে তোলবার আগে হাত থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্যে আরেকটা সিগারেট ধরাল ভবদেব।

ফুলটাকে মাটিতে অমনি ফেলে যাবার পর, মনে আছে সুনয়নী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল: দে ঐ গাছের নির্বংশ করে একেবারে শেকড় উপড়ে। কতদিনের চেষ্টায় কত কষ্ট করে ফুল ফোটানো হল। এখন বলে কিনা বাড়ির মালিক বাড়িউলি। এর পর হাটে-মাঠে-ঘাটে যেখানেই থাকি না কেন, মাথার উপরে বাড়িওলা নিয়ে যেন না বাস করতে হয়।

কি সব দিনই গিয়েছে! নিচের তলার ভাড়াটে, বাড়িওলার ভাব, সব রকমেই যেন নিচের তলায়। কুয়োর থেকে পাম্প করে জল দিত, তা ভাড়াটেরা সব শেষে। পাঁচ মিনিট হতে না হতেই সুইচ-অফ। কী ব্যাপার? ঝামা-মারা টান জায়গা মশাই, কুয়ো

শুকিয়ে এসেছে। এমনি নিত্যি। ভর-গ্রীষ্মের দিনে কলসী-কুঁজোও ভরাট হয়নি ; বর্ষায় যখন সচ্ছল জল তখনও বড়জোর দশ মিনিট। সট করে সুইচ অফ করে দিয়ে বলেছে, মফস্বলে ইলেকট্রিক কারেন্টের দাম কত।

প্রথম সরকারী ঝগড়া হয়েছিল চাকর রামলখনকে নিয়ে। নিচে আলাদা-মতন একটা ফালতু ঘর ছিল, ভাড়া দেওয়ার সময় বলা হয়েছিল, ওটা চাকরের ঘর, ভাড়াটেদের এজমালি। কিন্তু থাকবার বেলায় বাড়িওলার ড্রাইভার আর দারোয়ান। চলবে না কথায় ঘোর-ফের, চাকরের জায়গা দিতে হবে। মুখে হার মেনেছিল পরাশর, কিন্তু টিপে দিয়েছিল দারোয়ানকে! তার দাপটে সাধ্য কি রামলখন শোয় সেই ঘরের মধ্যে। তার জায়গা বারান্দায়।

সত্যি রামলখন আজ বারান্দায় শোয়নি তো? ভবদেব বলে দিয়েছে বাইরের ঘরে শুতে। কিন্তু বলা যায় না, যেমন বুদ্ধি, হয়তো প্রভুর নিরাপত্তার কথা ভেবে একেবারে বাইরের দরজা ঘেঁষে শুয়েছে। কে জানে সেইটেই হয়তো মস্ত বাধা হবে ক্ষণিকার।

খুট করে ছিটকিনি খুলে দরজা ফাঁক করে তাকাল একবার বাইরে। না, বারান্দা ফাঁকা। আশপাশ নিঝুম। দূরে ষ্টেশনের লাল-শাদা-সবুজ আলোর পিণ্ডগুলি জ্বলছে স্থির হয়ে। আপ ডুন আর ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস চলে গিয়েছে এতক্ষণে। আরো কত ট্রেন আসবে যাবে। যে ট্রেনের অবধারিত ষ্টেশন এই ঘর সেই আর এসে পৌছুল না!

যা অবধারিত তার জন্যে কেন এই অধীরতা?

চোখের উপরে একটা তারা জ্বলছে দেখতে পেল। যা অবধারিত তাতে সুখ নেই যা অভাবনীয় তাতেই সুখ। মেঘলা আকাশ দেখবে ভেবেছিল দেখল একটা তারা। অত্যাশ্চর্য আনন্দে ভরে উঠল মন।

এমনি একটা অত্যাশ্চর্যের জন্য প্রতীক্ষা করছে ভবদেব। অবধারিতের জন্যে নয়।

চরম ঝগড়া হয়েছিল সেদিন।

উপর থেকে ভিজে কাপড় ঝোলায় এই নিয়ে ভবদেবরা আপত্তি করেছে বহুদিন—বারান্দায় উঠতে-নামতে ঠিক নাকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়, মাথার উপরে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ে। শোনেনি বাড়িওলারা। বলেছে, ও ছাড়া জায়গা নেই কাপড় মেলবার। মুখের প্রতিবাদে কাজ হয়নি, তাই গেরো মেরে ভিজে কাপড়ের কুণ্ডলী পাকিয়েছে নিচে থেকে। ঢিল বা অন্য কিছু ধুলো-বালি বেঁধে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন অন্যরকম হয়েছিল। শুকিয়ে এসেছে একটা শাড়ি, খসে পড়েছিল নিচে, নিচের বারান্দায় সিঁড়ির উপর। বিকেলের ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল রামলখন, চোখে পড়তেই কুড়িয়ে নিয়েছিল ব্যস্ত হাতে। ভবদেব সেইমাত্র ফিরেছে আপিস থেকে, চোখোচোখি হতেই বলেছিল, 'রেখে দে।'

গুটিয়ে-পাকিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল রামলখন।

আর তক্ষুনিই তরতরিয়ে নিচে নেমে এসেছিল ক্ষণিকা।

সুনয়নীকে জিগেগস করেছিল, 'আমাদের একটা শাড়ি পড়েছে দিদি?'

'কই না তো!' সুনয়নী ভিতরের বারান্দায় চা করছিল, অবাক মানল। 'কি রকম শাড়ি? কার শাড়ি?'

'বৌদির শাড়ি। তেমন দামি কিছু নয়। কিন্তু নিচে পড়লেই যদি তা আর ফেরৎ না পাওয়া যায়—'

'বা, সে কি কথা? রামলখন তো এইমাত্র ঝাঁট দিচ্ছিল বাইরে। হ্যাঁ রে, রামলখন, বাইরে শাড়ি দেখেছিস একটা?'

মাটি-লেপা উনুনের মত মুখ করে রামলখন বললে, 'আমরা দেখতে যাব কেন?'

'বেশিক্ষণ হয়নি। আমিই তুলছিলুম, গেরো খুলতে পড়ে গিয়েছে—'

'হাওয়ায়ও তো উড়ে যেতে পারে—' ভিতর থেকে টিপ্পনি কেটেছিল ভবদেব।

উড়নতুবড়ির মত ঝলসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'মাপ করবেন দিদি, আমি সার্চ করব।'

'সার্চ করবে!' প্রথমটা থমকে গিয়েছিল সুনয়নী। পরে মুখে হাসি টেনে বলেছিল, 'এই দেখনা আমাকে।' বলে আঁচল ঝাড়া দিয়েছিল।

'বডি-সার্চ নয়, বাড়ি-সার্চ।'

'আপনি মেয়ে-পুলিশ নাকি?' ভবদেব এবার এসেছিল মারমুখো হয়ে: 'সঙ্গে ওয়ারেন্ট আছে?'

'ও সব চোর ধরতে ওয়ারেণ্ট লাগে না। কলকাতার বাসে-ট্রামে পকেট মারা গেলে প্যাসেঞ্জারদের পকেট সার্চ করার রীতি আছে।'

'এ একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ক্ষণু?' আপত্তি করেছিল সুনয়নী।

'হয়তো হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই।'

'উপায় নেই?' আবার ঝাঁজিয়ে উঠেছিল ভবদেব: 'আপনি কাউকে দেখেছেন চুরি করতে?'

'চোখে দেখিনি, কিন্তু কানে শুনেছি। শুনেছি, শাড়িটা নিচে পড়ামাত্রই একজন বলছেন আরেক জনকে, রেখে দে। পরের জিনিস জেনে তা ছলনা করে রেখে দেওয়াটাও অসাধুতা।'

'এতই যখন জানেন তখন সোজাসুজি এসে ভালোমানুষের মতন চাইলেই হত!'

'ভিক্ষে করে নেওয়ার চাইতে দাবি করে নেওয়ার মধ্যে গৌরব আছে।' যৌবনের অহঙ্কারে সারা গায়ে ঝঙ্কার তুলেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'দিয়ে দিন।'

রামলখনকে ভবদেব বলেছিল দিয়ে দিতে।

শাড়িটা পেয়ে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। মনে হয়েছিল যেন তার গায়ের অঞ্চল থেকে শূন্যে একঝাঁক বক উড়িয়ে দিল।

অবাক যত না হয়েছিল তার চেয়ে বেশি রেগে উঠেছিল সুনয়নী। 'তুই দিতে গেলি কেন? সার্চ করা বার করে দিতাম।'

'তুমিই তো লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ! নইলে ও কোন সুবাদে তোমাকে দিদি বলে? মাসি না, পিসি না, বৌদি না—'

'মনে হচ্ছে তোর সুবাদে।' ঠাট্টা করেছিল সুনয়নী।

'আমার সুবাদে! দেখি আজ থেকে সমস্ত সু বাদ দিলাম দিদি। বাসাড়ে যখন হয়েছি তখন চাষাড়েই হব ঠিকঠাক।'

সজ্ঝর একটা ফ্যান ভাড়া করে এনেছিল ভবদেব। এ-সি কারেন্টের পাখা, বাটি-সুদ্ধ ঘোরে। পুরো দমে চালালে প্রলয়ঙ্কর শব্দ হয়, ঘর-দোর কাঁপে, মনে হয় সিলিং বুঝি ফেটে পড়বে। সেই শব্দ উপরে যায়, উপর থেকে ফেরাফিরতি বল খেলে, দুপ-দাপ চালায়, কিন্তু কতক্ষণ চালাবে, এদিকে পাখা ঘুরছে দিন-রাত।

শুধু তাই নয়, শুরু করেছিল দেয়ালে পেরেক ঠুকতে, শার্সি ভাঙতে, মেঝেতে হাতুড়ি পিটতে। আর কি করা, উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল বাড়িওলা। উলটে রেণ্ট কণ্ট্রোলারের কাছে নালিশ করল ভাড়াটে। জল বন্ধ, আলো বন্ধ।

লাগ ভেলকি লাগ।

এমনি যখন জলদতালে বাজনা বাজছে, তখন খবর এল ভবদেবের চাকরি স্থায়ী হয়েছে। প্রমোশন পেয়েছে ইউরোপীয়ান গ্রেডে। কিছুকাল পরেই কোয়ার্টার্স দেবে কোম্পানি।

দেখতে-দেখতে একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। খারিজ হয়ে গেল সমস্ত মালিমামলা। আকাশ বাতাসের বদলে গেল চেহারা। নিচের ঘরে আলো জ্বলল শুধু নয়, নতুন পয়েণ্ট বসাল পরাশর। জল দিতে লাগল চৌবাচ্চা ছাপিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল উপরের দুপদাপ।

কাপড় শুকোতে লাগল ছাদের উপরে প্রসারিত হয়ে। শুধু তাই নয়, পরাশর নতুন একটা নিঃশব্দ পাখা দিলে ভবদেবকে। ভাড়া? ভাড়ার জন্যে কি।

আশ্চর্য, সময়ে অসময়ে নিচে নামতে লাগল ক্ষণিকা। সুনয়নীর কাজ-কর্মে হাত মেলাতে লাগল। দু-একটা রান্নাও নাড়ল-চাড়ল। কখনো-সখনো হাত রাখতে লাগল ভবদেবের টেবিলে। ভবদেবেরও ঘন-ঘন নেমন্তন্ন হতে লাগল উপরে। পরাশরের মা আর বৌদিও চলে এল সামনে, নতুনতরো আত্মীয়তার আলো ফেলে।

পরাশরের মা বললেন, গায়ের রং একটু কালো হলে কি হবে, দিব্যি স্বাস্থ্য।

'আর লেখাপড়া?' ফোড়ন দিল বৌদি।

সব জানা আছে। মনে-মনে হেসেছিল ভবদেব। আসলে চাকরি, বড় বাহালি চাকরি। আসলে টাকা। আসলে কোয়ার্টার্স।

হাল ঠিক ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু মুষ্টিটা একটু শিথিল করেছিল ভবদেব। দেখি হাওযাব টানে কোথায গিয়ে উঠি, কোন রোমাঞ্চের বন্দরে। দেখি উদ্ধত কি করে বিগলিত হয। দুরূহ-দুর্জ্ঞেয় কি করে সরল হয়ে আসে।

দক্ষিণের আকাশ অনেকখানি জুড়ে লাল হয়ে উঠেছে। বার্ণপুরের ফার্নেস। যেন উদ্যত বজ্রের মতো জ্বলছে কোথায় মহাভয়ঙ্কর। দাহের ওপারে নির্দয় শাসনের মত। যেন বলছে রূঢ়ভাবে, তর্জনী আস্ফালন করে, কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম চলবে না, কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, নেই কোনো বিচ্যুতির নিষ্কৃতি।

তাই, ভয় পেয়ে গিয়েছে ক্ষণিকা। কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ভয়ের কুণ্ডলীর মধ্যে অভ্যাসের জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

যদি এই ভয়টুকু না থাকে তবে কিসের জয়। এই ভয়টুকু আছে বলেই তো নির্জন গিরিশিখরের ডাক। ডাক সেই পথ-হারানো

গহন অরণ্যের। সঙ্গলেশহীন সমুদ্রতীরের। সেই ডাকটি কি এই মহান রাত্রি পৌঁছে দিতে পারেনি ক্ষণিকার কানে-কানে ?

বটেই তো। সেও নুন-নেবু মেশানো ফিকে জল-বার্লি। একটি অভ্যস্ত জীবনের জীর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে। রাত্রির ক্লান্তিতে প্রতিটি প্রভাতকে মলিন দেখবার বাসনায়। নেই তার মধ্যে সেই আনন্দোদ্ভব উদ্‌ঘাটনের স্বপ্ন। সর্ব-অর্পণের ব্যাকুলতা। রাজকন্যার ভিখারিণী সাজবার তাপসশ্রী। তাহলে তাকে দিয়ে আর কি হবে ? যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে মহারাত্রির মৌনে, সমস্ত হিসেব-কিতেবের বাইরে, কোনো রকম কৃত্রিম মীমাংসা না মেনে—এই উজ্জ্বলতাটুকু এই নবীনতাটুকু যদি সে উপহার দিতে না পারে, তবে তার দাম কি, তবে তার মহত্ত্ব কোথায় !

ভালোবাসা না ছাই। মোটা জাঁকালো চাকরি। টাকা। স্ববাসের কাছে কোয়ার্টার্স।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে দিয়েছিল পরাশর। চলুন যাই কল্যাণেশ্বরী, বরাকরের ডাকবাংলো। ওবার তোপচাঁচি। এবার আরো দূরে, পরেশনাথ।

কেমন একটা ঘোর-ঘোর নতুন দৃষ্টি এসেছিল ভবদেবের চোখে। রক্তে নতুনতরো আস্বাদ। হঠাৎ ঘুম-ভেঙে যাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মনে-পড়ে-যাওয়ার সুগন্ধ। নতুন দৃষ্টির সঙ্গে নতুন দৃষ্টির যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সমস্তই যেন চক্ষুময় হয়ে ওঠে। অলক্ষ্য একটি নিমন্ত্রণের ভাষা নীরবে গুঞ্জরণ করতে থাকে। আশ্চর্য, যে চোখে আগে চকমকি পাথর ছিল তাতে এখন একটি লজ্জা একটি গম্ভীর কোমলতা দেখা দিয়েছে। একটি ধরা-পড়ার প্রস্তুতির লাবণ্য। কি করে এ সম্ভব হতে পারে ভেবে পায়নি ভবদেব। কে রচনা করল এই রুক্ষ মাটির শ্যামায়ন। নিষ্পাদপের দেশে অজানা পক্ষিকাকলী।

কিন্তু ঐখানেই শেষ। আর কোন ঐশ্বর্য নেই। শুধু একটি দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে সমাপ্তি পাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

সুনয়নীকে বলেছিলেন পরাশরের মা: 'তুমিই তো কর্ত্রী। এখন বলো কি তোমার দাবিদাওয়া।'

'দাবিদাওয়া যে কিছু নেই তা আমি জানি।' সুনয়নী বলেছিল হেসে হেসে, 'কিন্তু আমিই কর্ত্রী কিনা তাই জানি না।'

সেই দাবিদাওয়া জানাবার জন্যেই সেদিন এসেছিল ক্ষণিকা। ছুটির দ্বিপ্রহরে। সুনয়নীর সুতো ধরে ভবদেবের নির্জনতায়।

ভবদেব বলেছিল, 'একদিন মধ্যরাত্রে আসতে পারো?'

দু চোখে অন্ধকার দেখেছিল ক্ষণিকা। ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছিল।

'চার দিকে এত ভিড়, কোনো সম্ভাবনা নেই, তা আমি জানি।' রাজনীতিকের নিরুদ্বেগ গলায় বলেছিল ভবদেব: 'কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের ষড়যন্ত্রে যদি কোনো দিন সেই মসৃণ মহারাত্রি আসে, আসবে?'

মুচকে হেসে সম্মতির ঘাড় নেড়েছিল ক্ষণিকা।

সেই মহারাত্রি সমাগত। কিন্তু ক্ষণিকার সাড়া নেই। আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতির নিচে আত্মদানের স্বাক্ষরটি ছিল না। পরিমিত জীবনের অপ্রমত্ত শান্তির কূপে তৃষানিবৃত্তির অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রির মঞ্জুষায় দিল না তাকে একটি উজ্জ্বলতম দিনের উপহার। দিল না তাকে একটি বাঙ্ময়ী নিস্তব্ধতা। তার পৌরুষকে মহিমান্বিত করল না একটি বলবান বিশ্বাসে।

সত্যিই তো, বিশ্বাস কি। যদি অবশেষে ছিন্নসূত্র মালার মত ধুলোয় ফেলে দেয় ভবদেব! কে না জানে অবিবেকী পুরুষের খামখেয়াল! যদি তার কাছে সহসা সমস্ত মূল্য খুইয়ে বসে! যদি এক লহমায় সমস্ত রহস্যের অবসান হয়! যদি শেষ ছত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই কবিতাটি থেমে যায়, সমস্ত কথা, সমস্ত সুর যায় ফুরিয়ে।

তার চেয়ে নিষ্পত্তির দৃঢ়ভূমি অনেক ভালো। অনেক ভালো ধৈর্যের ফুলশয্যা।

সে তো শুধু একটা নিয়মপালনের রাত্রি। সে সব ফুল তো

বাজারে কেনা। কিন্তু সে ফুলশয্যার চেয়ে এ তৃণশয্যার অনেক ঐশ্বর্য। আকাশের অনাবৃতির নিচে শ্যামলতার উন্মুক্তি।

তবে তাই হোক, এখানেই ইতি পড়ুক। তোমার অক্ষত অন্তরের পুণ্যস্থানে ফটক এঁটে দাও। তুমি থাকো তোমার অক্ষোভে অক্ষুণ্ণ হয়ে। আমি এবার শুয়ে পড়ি। ভবদেব বিছানার দিকে তাকালো। এবার শুয়ে পড়ি। বৃষ্টিটি আর নেই।

অন্যায্য অভিমান করে লাভ কি। বাধাবিঘ্নগুলোও বুঝতে হয়। বড় বন্ধনগুলো নেই বটে কিন্তু ছোট কণ্টক অনেকগুলি।

'বিমলাকেই আমার বেশি ভয়।' বলেছিল ক্ষণিকা। 'ওর দুটো রোগ, দুটোই সাংঘাতিক। এক হিংসে, দুই অনিদ্রা।'

'দুটো বড়ি দিচ্ছি, খাইয়ে দিয়ো চালাকি করে।' বলেছিল ভবদেব।

এটুকু এলেকার মধ্যে চার-চার ঘর ভাড়াটে বসিয়েছে পরাশর। সাধে কি আর ভবদেব তাকে হাড়কিপ্পন চশমখোর বলে! গ্যারাজের উপরে দুখানা ঘর তুলে ভাড়া দিয়েছে বিমলা আর বিমলার মাকে। বিমলার মা ধাইগিরি করে। রাত্রে যদি কল আসে তবে বিমলাকে ক্ষণিকার কাছে শুতে পাঠায়। তেমন যদি কিছু ঘটে আজ অঘটন তাহলেই তো বিপদ! একে পাশে শোবে তায় আবার ঘুম নেই।

কিন্তু ভবদেবের নিজের ভয় নাগমশাইকে। ভাড়াটে বসাবার আগে আর বাছবিচার করেনি পরাশর। কোথাকার এক বিপত্নীক নিঃসন্তান ঠিকেদারকে ঘর দিয়েছে একখানা। জীবনে দুটি মাত্র ব্যসন, রাতে চোর ধরা ও দিনে নাকের ডগায় চশমা বসিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে ইতি-উতি উঁকিঝুঁকি মারা। পাড়ার রক্ষীদলের সর্দার। জানলা দিয়ে কোন চোর হাত বাড়াল কোন মশারির মধ্যে, কোথায় গার্ডে-ড্রাইভারে ষড় করে ট্রেন থামিয়ে ওয়্যাগন ভাঙল—এই সবেরই ফিরিস্তি করে। বাড়ির আনাচে-কানাচে, কখনো বা ট্রেনের লাইনের

ধারে-ধারে টহল দেয়। যখন ঘরে থাকে, জানলার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁকে চশমা ঠেকিয়ে চেয়ে থাকে।

শুধু নাগ নয়, কালনাগ। দুপেয়ে সাপ। তার উদ্যত ফণা ডিঙিয়ে আসা কি সহজ কথা?

তারপর ওদিককার একতলার সেডের খগেন মিত্তির। সে আবার যোগধ্যান করে। করবি তো কর ঘরে বসে কর। তা নয়, ঘরের বাইরে এজমালি গেটের কাছে আম গাছটার তলায় চেয়ার পেতে বসে থাকে। চোখ বুজে শিরদাঁড়া খাড়া করে। সত্যিকার হলে ভাবনা ছিল না, টের পেত না কিছু। ভণ্ড বলেই ভয়। চোখ চেয়ে দেখে ফেলবে ঠিক সময়।

বৃষ্টিতে উপকার করেছে। যোগীবর ঘরে গেছেন। কিন্তু নাগ-মশায়ের খড়খড়িটির কি দৃশ্য কে জানে। কে জানে বড়ি খেয়ে কেমন আছে বিমলা। কে জানে তার মা কোথায়।

ভুল করে না ইচ্ছে করে নিজেই বড়ি খেয়ে ফেলেছে কিনা তার ঠিক কি।

বাধা হয়তো আর কোথায়ও নয়, বাধা তার মনে। সে আত্মীয় হতে চায়, আপন হতে চায় না। সংহত তুষারপিণ্ড হয়ে থাকবে, হবে না সীমাতিক্রান্তা নির্ঝরিণী। এও একরকম অহঙ্কার। আমি পবিত্র, আমি অব্যাহত, আমি অপ্রমত্ত এই অহঙ্কার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ভবদেব। বি-এন-আরের রাত্রের ট্রেনটাও চলে গেল এতক্ষণে। আর কি। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল এক গ্লাশ। এবার পরাভূত শয্যায় গিয়ে লজ্জিত ঘুমটুকু সেরে নি।

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।

হৃৎপিণ্ড শব্দ করে উঠল নাকি? রুদ্ধদ্বার দেবমন্দিরে কি আপনা থেকেই ঘণ্টা বেজে উঠল।

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।

কোন দিকের দরজা ? ভিতর বারান্দার, না, বাহির বারান্দার ? কোন সিঁড়ি দিয়ে নামল ? বিমলা কি ঘুমিয়েছে ? তার মার আর কল আসেনি ? নাগমশায়ের খড়খড়ি কি বুজে গেছে ? ছাড়া চেয়ারে আবার এসে বসেনি তো যোগীবর ?

ও কি, কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে ? দরজা বন্ধ দেখে ও আবার ফিরে যাবে নাকি ?

খুট করে ছিটকিনি টানল ভবদেব। দরজাটা একটু ফাঁক করল। সুট করে ঢুকে পড়ল ক্ষণিকা। নিয়তির পরিহাস নয়, সত্যিসত্যি ক্ষণিকা।

কাঁপছে, লতার মত কাঁপছে। যত ঠাণ্ডায় নয় তত ভয়ে। যত উচ্ছ্বাসে নয় তত উৎকণ্ঠায়। শুধু বললে, অস্ফুট নম্রস্বরে বললে, আমি এসেছি।

মাধুর্যসিন্ধুর দুটি তরঙ্গের মত মনে হল শব্দ দুটোকে। আমি এসেছি। হে গুহাহিত গোপন পুরুষ, আমি এসেছি। হে আকর্ষী বংশী, আমি শুনেছি তোমার ডাক, চিনেছি তোমাব পথ। তুমি এবার আমাকে ধরো, আমাকে নাও, আমাকে ভাঙো। আমাকে শূন্য করে পূর্ণ করো।

কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারল না ভবদেব। হাত ধরে টেনে আনল না কাছে, বসতে বলল না বিছানায়, কি আশ্চর্য, দরজায় ছিটকিনি লাগাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

ইলেকট্রিক লাইট নয়, মোমবাতি জ্বালাল ভবদেব। স্নিগ্ধ আলোতে দেখল ক্ষণিকার ক্ষণকরুণ মুখখানি। ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনীর মুখ।

বললে, 'তুমি এসেছ। এর উত্তরে আমি কী বলতে পারি ? বলতে পারি, আমি আছি। একজন আছে, আরেকজন আসে। এ আছে বলেই তো সে আসে। আর সে আসবে বলেই তো এ বসে আছে অন্ধকারে। তাই নয় ?'

অদ্ভুত সুন্দর করে হাসল ক্ষণিকা।

'তোমাকে কী দিই বলো তো?' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ভবদেব। খোলা জানলা দিয়ে হাত বাড়াতেই পেল সেই গোলাপ গাছ। বৃন্তাশ্রয়ে বিহ্বল একটি গোলাপ জেগে আছে। ঘ্রাণে-বর্ণে গদগদ হয়ে। শুষ্ক গর্বরূপে নয়, সুধাসরস প্রেমরূপে। নিবেদনের বেদনায় আনন্দময় হয়ে।

সন্তর্পণে ফুলটি ছিঁড়ল ভবদেব। ক্ষণিকার স্তূপীকৃত চুলের মধ্যে গুঁজে দিলে।

দরজা খুলে এগিয়ে দিতে গেল ক্ষণিকাকে।

ক্ষণিকার চোখে জলের ছোঁয়া লেগেছে। ছোঁয়া লেগেছে কণ্ঠস্বরে। আর্তস্বরে বললে, 'এ কি, আপনি চললেন কোথা?'

'বা, সে কি কথা? তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনি?' দেয়ালের পাশে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকা। ছায়া হয়ে মিশে যেতে চাইল। বললে, 'যদি কেউ দেখে ফেলে, সব বুঝে নেবে।'.

'যাতে ভুল না বোঝে তাই তো আমি চাই। বলো কোন সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলে? বিমলাকে কটা বড়ি দিয়েছ? নাগমশায়ের খড়খড়ির ফাঁক ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করেছ নাকি? আর যোগীবরের কি খবর? যোগনিদ্রার চেয়ে সুখনিদ্রা অনেক আরামের। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও গে। কোনো ভয় নেই—'

পরিত্যক্ত বিছানায় এসে শুলো ক্ষণিকা। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

গুহ

তোমার উকিল আছে ?

কোমর থেকে দড়ি আর হাত থেকে হাত-কড়া খুলে নিল কনষ্টেবল। খাঁচায় গিয়ে দাঁড়াল মোজাহার। করজোড়ে বললে, গরিবগুর্বো লোক, উকিল পাব কোথায় ?

চার্জ পড়ে শোনালেন পাবলিক-প্রসিকিউটর। বলো, দোষী না নির্দোষ ?

নির্দোষ। আমি বিচার চাই।

একে-একে পাঁচ জনকে ডেকে নিয়ে তৈরি হল জুরি। পি-পি ঘটনার বর্ণনা শুরু করলেন—

তার পর সালিশ বসল।

এর আবার সালিশ কি ! সালিশের কি দরকার !

এমনিতেই একটা ছেলের অসুখ করলে মুখ কালো হয়ে যায়। হাতে-রথে বল থাকে না। ছেলের অসুখ কবেছে, ডাক্তাব-বদ্যি করেও ভালো কবতে পারছি না, মনে হয় কত যেন অপবাধ করেছি সংসাবের কাছে ! তারপব ছেলে যদি মারা পড়ে, তবে কি ছেলের জন্যে কাঁদি ? কাঁদি নিজের প্রতি ঘৃণায়। নিজের হেরে-যাওয়ায়। কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না।

এ তো আর কিছু নয়, কাটা গায়ে নুন বুলোনো। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া।

মাওলা বক্স বললে, তুমি বুঝছ না। সালিশ হলেই ওকে গাঁ থেকে তাড়ানো সহজ হবে।

কাকে ? আঁতকে উঠেছিল মোজাহার।

আর কাকে ! সদরালিকে। সাত দিনের সময় দেব। চলে

যাবে দেশ ছেড়ে। তখন থাকতে পাবে শান্তিতে। জঙ্গল কাটবার সময় বাঘের ভয়ে থাকতে হবে না টোঙের উপর।

চল। মোড়ল-মাতব্বরের ফরমান। পঞ্চ ভদ্রের মীমাংসা। সমাজের সম্মানী লোকদের মানতে হয়। সকলের বলেই একলার বল।

বেশ তো, করো না তোমরা সভা। যাকে তাড়াবার তাকে তাড়িয়ে দাও চুনকালি মাখিয়ে। আমাকে ডাকো কেন? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।

বা, তা কি হয়? তোমার নালিশ, আর তুমি থাকবে না দশ-সালিশে? বাদীব অভাবে কি মামলা চলে?

নালিশ তো আমার একলার নয়। নালিশ তো শহরবানুরও।

আহা, সে পর্দার বিবি। সে কেন আসবে? পর্দার বাইরে তাকে নিয়ে যেতে চাইলেই তো সে আর বেপর্দা হয়ে যায় নি।

তার মানে, মোজাহার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তুমি একা গিয়ে দাঁড়াও। মার-খাওয়া ভিখিরির মত মুখ কালো করে চেয়ে থাকো। পাঁচ জনের খোঁচা-খোঁচা কৌতূহল মেটাবার জন্যে বলো সব কেচ্ছাকাহিনী। বলো কেমন টোকা মারত বেড়ার গায়ে। কেমন গান ধরত, 'মা আমার দে না বিয়ে সাধের যৌবন ভেসে যায়।' হাট থেকে কেমন কিনে আনত রেশমী চুড়ি, পুঁতির মালা, কখনো বা এক শিশি সুশীল-মালতী—সেদিন তো একেবারে আস্ত-মস্ত শাড়ি একখানা। নকসি-পেড়ে নীলাম্বরী। কত বারণ করেছে মোজাহার, কানেও তোলেনি শহরবানু। বলো সে সব অক্ষমতার কথা। তোমার গরিবানার কথা। বলো তুমি বুড়ো, তুমি অথর্ব, ঘাটের পাড়ের পচা খুঁটি। রঙ্গিলা পালের নাও এবার ছেড়ে দাও স্রোতের টানে।

বললেই হল? বার বছর ঘর করেছি। চাষী জমি হোক, ঘাসী জমি হোক, নুনে-ভাতে লঙ্কায়-পান্তায় বশ রেখেছি বাহুবলে। বুকজোড়া ভালোবাসায়। তিন-তিনটে ছেলে ধরেছে পেটে।

কোব্বাত, জিন্নাত আর বিল্লাত। ছোটটা মোটে ছ বছরের। ছেড়ে গেলেই হল? ঘর তুলেছি ওর জন্যে, মাটি কেটেছি, গাছ লাগিয়েছি। হোলই বা না খড়ের ঘর, বাঁশের বেড়া, তাতেই সাত রাজার ধন এক মাণিকের রাজত্ব। আমার মুকুট দিয়ে কি হবে যদি মালা পাই, বিবি দিয়ে কি হবে যদি বউ পাই মনের মত।

কোনো দিন মন্দ-ছন্দ কইনি। উঁচু রা করিনি। হাত তুলিনি। তবু, ওর কি দোষ? অত বিরক্ত করলে কে থাকতে পারে মন মজিয়ে? বারে-বারে আকাশ দেখালে পাখির কি দোষ! জানা বাসার চেয়ে অজানা বিদেশ বুঝি বেশি মনোহর!

নদীর ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে ধরা পড়ল। গ্রামরক্ষীর দল শহরবানুকে পৌঁছে দিল ঘরে। ও যে ফের ঘরে ফিরেছে তাইতেই মোজাহারের ফুর্তি। শুধু-পাওয়ার চেয়ে ফিরে-পাওয়ায় বুঝি বেশি ঝাঁজ।

ঘাট মেনেছে শহরবানু। নাকে-কানে খত দিয়েছে। কসম খেয়ে বলেছে যাবে না আর চৌকাঠ ডিঙিয়ে। এতেই মোজাহারের শান্তি। মোজাহারের দিলাসা।

'তোমরা ওটাকে গাঁয়ের বার করে দিতে পারো না?' শহরবানুও ঝামটা মারল: 'ওই তো যত নষ্টের গোড়া। পরের বাড়ির দোর ধরে বসে থাকে। তুমি কী করতে সোয়ামী হয়েছ! গায়ের রক্ত গরম হয় না তোমার? মেরে তুলো ধুনে দিতে পারো না বে-আক্কেলের?'

সত্যিই তো। প্রতিকার তো স্বামীই করবে। তারই তো দায় স্ত্রীকে কবজায় রাখা। কেউ যদি সেই অধিকারে দাঁত বসায়, আইন তো তাকেই সাজা দেয়, দুর্বল মেয়েটাকে নয়।

তবে তাই হোক। সালিশই হোক। অন্ন মণ্ডল আছে, আছে হাফেজ কবিরাজ। আলিম মুন্সুল্লি। সুরাহা একটা হবেই।

আমার মুখ কালো হয় তো হোক। কিন্তু ওর মুখে যেন রোদ ওঠে।

রায় দিল সালিশ। শহরবানু ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে ঘরের ঘেরাটোপে। মোজাহার নেবে তাকে ধুয়ে-মুছে। আর, সাত দিনের ওয়াদা, সদরালি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, বেপাত্তা হয়ে।

সাতদিন কেন? গর্জে উঠল সদরালি: আজ, এখুনি, এই দণ্ডে চলে যাব। আর একা যাব না। সঙ্গে নিয়ে যাব শহরবানুকে।

সত্যি-সত্যিই সে ডাক দিল। আর, চাঁদ দেখে জোয়ারের জল যেমন করে তেমনি করে ছুটে এল শহরবানু। এক বস্ত্রে। এলো-চুলে। গা ঘেঁষে দাঁড়াল সদরালির।

মুহূর্তে কী হয়ে গেল মোজাহারের কে বলবে! উঠোনে পড়ে ছিল একটা বাঁশের মুগুর, তাই তুলে নিয়ে বসালে এক ঘা। এক ঘা-এর উত্তেজনায় আবো কয়েক ঘা পড়ল পর-পব।

লুটিযে পড়ল শহরবানু। মাথা ফেটে রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। দেখতে-দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

প্রথম সাক্ষী অন্ন মণ্ডল। যারা সালিশে বসেছিল তাদের যে প্রধান। অকু প্রায় তাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। তারা সব স্বাধীন সাক্ষী।

বলো কি ঘটেছে। কি দেখেছ নিজের চোখে। উচিত-অনুচিতের কথা নয়, ধর্মাধর্মের কথা নয়, আইন প্রত্যক্ষের কারবারী। সেই প্রত্যক্ষের খবর বলো।

যা ঘটেছে হলফান বলে গেল অন্ন মণ্ডল।

হাকিম জিগগেস করলেন মোজাহারকে, 'কি, কিছু জিগগেস করবে?'

একবার বাঁকা চোখে তাকাল মোজাহার। এই সব সত্যি ঘটনা? আর কিছু নয়? কিন্তু কি ভেবে চোখ নামিয়ে বললে, না।

দশ সালিশের লোকেরা কাঠ-বাক্সে উঠতে লাগল পর-পর।

জেরা নেই, তবু মূল জবানবন্দিতেই হল কিছু গরমিল। কেউ বললে, বাঁশের মুগুর নয়, কাঠের হুড়কো দিয়ে মেরেছে। কেউ

বললে, কে যে মেরেছে বলা শক্ত—সদরালি আর মোজাহারে লেগেছিল ছড়দঙ্গল, দু'জনের হাতেই বাঁশের ডাণ্ডা, শহরবানু ঝাপিয়ে পড়েছিল মাঝখানে, কার ডাণ্ডা মাথায় পড়েছে দেখিনি ঠাহর করে। আরেক জন তো স্পষ্টই বললে, সদরালিই হয়তো মেরেছে ব্রহ্মতালুতে।

'জেরা করবে কিছু?'

'কিছু না। কাউকে না।' আওয়াজে এতটুকু উৎসাহ নেই মোজাহারের: 'যে যেমন বলতে চায় বলুক।'

আশ্চর্য, সদরালিও সাক্ষী দেবে?

কেন দেবে না? সত্যি তো সত্যিই। তার কাছে ন্যায় নেই, নীতি নেই। কী ঘটলে ভালো হত তার চেয়ে যা ঘটেছে তাই বেশি দামী।

দিব্যি বলে গেল মুখ ফুটে।

হ্যাঁ, নিয়ে গিয়েছিলাম বের করে। কোনো জোর ছিল না জোচ্চুরি ছিল না, দিনের আলোয় সবার নাকের উপর দিয়ে নিয়ে গেলাম। আইনের চোখে দোষ ধরতে শুধু পুরুষের। মেয়েদের কি আর দোষ হয়? কিন্তু মেয়ে না পা বাড়ালে পথও যে পা বাড়ায় না। কিন্তু আটকালো রক্ষী লক্ষ্মীছাড়ারা। পুলিশচালানী কেস হতে পারল না, শহরবানু সাবালিকা আর সে নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছে—

শ্রান্ত হয়ে কখন বসে পড়েছিল খাঁচার মধ্যে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মোজাহার। ইচ্ছে করে বেরিয়েছে? জানা ঘর ছেড়ে অজানা পথ কখনো বড় হয়? পুরোনো পুরুষের চেয়ে নতুন বিদেশী বেশি লোভের? কিছু একটা বলবার জন্যে হুঙ্কার দিয়ে উঠল মোজাহার।

পি-পি বললেন, 'এখন নয়, জেরার সময় জিগগেস কোরো যা খুশি।'

তাই সালিশ বসাল গাঁয়ের মাথারা। জবানবন্দির জের টানল

সদরালি। ফয়সালা হল, শহরবানু ফিরে যাবে তার স্বামীর কাছে। আর আমি সাত দিনের মধ্যে বাস তুলে নেব গাঁ থেকে। দু-কান-কাটার আবার ভয় কি। সে যাবে গাঁয়ের মধ্যিখান দিয়ে। সাত দিনের টালমাটাল কেন ? এক্ষুনি, এই দণ্ডে, চক্ষের পলক পড়তে-না-পড়তে চলে যাব। কিন্তু খালি হাতে নয়। সঙ্গে করে নিয়ে যাব শহরবানুকে।

শহর। হাঁক দিলাম উঁচু গলায়। চললাম দেশ ছেড়ে। সীমা ছেড়ে। অন্ত ছেড়ে। সঙ্গে যাবে তো চলে এস এই দণ্ডে।

সত্যি-সত্যি চলে এল। সে কি আমি ডেকেছি, না, আর কেউ ডেকেছে ? আর কেউ ডেকেছে। যে ডেকেছে তার নাম মরণ।

ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে এল মোজাহার। হাতে বাঁশের মুগুর। এখনো সেই মুগুরে রক্তের দাগ ও লম্বা কালো চুলের গুছি লেগে আছে। পিছন থেকে শহরবানুর মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা—

মিথ্যে কথা। উকিল লাগাতে পারলে মামলা ঠিক ঘুরিয়ে দিতে পারত। মিথ্যে কথা। সালিশের মীমাংসা মেনে শহরবানু ফের যখন স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকল সেই থেকেই তুমি ক্ষেপে গিয়েছ। সাত দিনে গাঁ-ছাড়া হওয়ার চেয়ে তা কঠিনতরো অপমান। তাই তুমি প্রতিশোধ নেবার জন্যে শহরের মাথায় লাঠি মারলে। কিংবা জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে ফের, স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তিন ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সে 'না' করে দিলে। আর অমনি মাথায় তোমার খুন চাপল।

দাঁড়াও, জেরা আছে। জেরায় ইঙ্গিত দেওয়া চলবে। ইঙ্গিত না টিকলেও সেই কারণে আসামী দোষী বনবে না। সবল স্বাধীন সম্পূর্ণ প্রমাণ চাই। সঙ্গত সন্দেহের অতীত যে প্রমাণ।

'কি, জেরা করবে ?' পি-পি প্রশ্ন করলেন।

দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে-আস্তে বসে পড়ল মোজাহার। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। না, জেরা করে কি হবে! জেরা করার আছে কি!

সুরতহাল তদন্ত করেছিল যে ইনস্পেকটর সে এল। লাশ যে সনাক্ত করেছে এল সে কনষ্টেবল। ময়না-তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে যে ডাক্তার সেও হলফ নিলে।

তার পর এল, আর কেউ নয়, কোব্বাত। দশ-বারো বছরের সরল শিশু।

ও মা, তুইও সাক্ষী দিবি? বলবি বাপের বিরুদ্ধে?

কার বিরুদ্ধে সেইটে কথা নয়। কথা হচ্ছে সত্যের স্বপক্ষে। বলছি সমাজের স্বপক্ষে।

কিন্তু ও-ছেলে জানে কি সাক্ষী দেওয়ার? পুলিশ যা শিখিয়ে দেবে তাই বলবে বুঝি? তা কেন? যা ঘটেছে যা দেখেছে তাই ঠিক-ঠিক বলবে। এতটুকু নড়চড় হবে না।

আশ্চর্য, ঠিক-ঠিক বললে কোব্বাত। এতটুকু ভয় পেল না, গলা শুকিয়ে গেল না কাঠ হয়ে। সদরালির সঙ্গে চলে যাবার জন্যে মা বেরিয়ে আসতেই বা'জান মাথায় দিলে এক মুগুরের বাড়ি। শুধু কি একটা? পর-পর অনেকগুলি—মাথা ফেটে রক্ত বেরুল ফিনিক দিয়ে। মা পড়ে গেল মাটির উপর—

'আমি জেরা করব।' উঠে দাঁড়াল মোজাহার।

পিতার সুপুত্র তুমি, বাপকে জেলে না পাঠালে তোমার সুখ নেই।

গলা-খাঁকরে জিগগেস করল মোজাহার: 'কেমন আছিস?'

বাপের দিকে চাইল একবার করুণ চোখে। গলা নামিয়ে বললে, 'ভালো আছি।'

'জিন্নাত কেমন আছে?'

'ভালো।'

আর বিল্লাত ? কার কাছে শোয় ? কাঁদাকাটি করে নাকি রাত্তিরে ?'

হাকিম হুমকে উঠলেন : 'এ সব জেরা চলবে না। ঘটনার সম্বন্ধে কিছু জিগগেস করবার থাকে তো করো।'

মোজাহার ঢোঁক গিলল। বললে, 'কে রান্না করে দেয় তোদের ?'

হাকিম ধমক দিলেন কোব্বাতকে : 'উত্তর দিও না।'

'খোরাকি পাস কোথায় ? ঘরে কি কিছু ছিল ধান-চাল ?'

কোব্বাতের মুখে কথা নেই।

'মাটি দেবার আগে গা থেকে জেওর কখানা খুলে রাখতে পেরেছিলি ? ঘরে আছে যে শাড়ি-কাঁচুলি আয়না-কাঁকই ফিতে-কাঁটা নেয়নি তো চোরে-ডাকাতে ? ঘর ছাইবার যে খড় কিনেছিলাম উঠোনে পচছে পড়ে-পড়ে ?'

পি-পিও এবার হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বসে পড়ল মোজাহার।

কোব্বাতে নেমে গেল। বসল শত্রুদলের সাক্ষীর এলেকায়। বসল পর হয়ে।

এবার তুমি এস। তোমার জবানবন্দি চাই। সাক্ষ্যপ্রমাণ সব শুনেছ, বলো, তোমার কী বলবার আছে।

মোজাহারের আর কিছুই বলবার নেই। হুজুর, আমি নির্দোষ।

সাফাইসাক্ষী আছে কিছু ?

না।

আবার ফিরে গেল খাঁচায়।

সরকারী উকিল সওয়াল শুরু করলেন। এ মামলায় বেশি কিছু বক্তৃতা করবার নেই। প্রথম দেখুন শহরবানু খুন হয়েছে কিনা। আর খুন যদি হয়ে থাকে, মোজাহার করেছে কিনা। দুইই একেবারে প্রমাণ হয়েছে কাঁটায়-কাঁটায়। সাক্ষ্যবাক্য সব একতরফা। এদিক-ওদিক যেটুকু গরমিল হয়েছে, তা খুঁটিনাটি ব্যাপারে। সে সব

উপেক্ষার যোগ্য। শাখা-পাতা ছেড়ে দিয়ে দেখুন মূল-কাণ্ড ঠিক আছে কিনা। তা যদি থাকে আপনাদের সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন।

এবার জুরিদের বোঝাতে বসলেন হাকিম। আইনের ব্যাখ্যা, ঘটনার বিশ্লেষণ। গোড়াতেই জেনে রাখুন আপনারাই চূড়ান্ত বিচারক। প্রমাণের ভার সরকার পক্ষের। প্রমাণ কাকে বলে? আপনাদের কাছে যা বিশ্বাস্য আইনে তা প্রমাণিত ; আসামীর পক্ষে উকিল নেই তাই বিশেষ সতর্ক হবেন। কিন্তু সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও যদি বিশ্বাস করেন মোক্তাহারই মেরেছে তার স্ত্রীকে, তা হলে দোষী বলতে দ্বিরুক্তি করবেন না। এখন দেখুন, অবিশ্বাস করবার কি কোনো কারণ আছে? যদি বোঝেন মতলব করে ভেবে-চিন্তে মেরেছে তবে এক রকম শাস্তি, আর যদি বোঝেন ঝোঁকের মাথায় হলেও পরিণামে কি হতে পারে জেনে-শুনে মেরেছে তবে আরেক রকম শাস্তি—

কোর্ট-ঘর লোকে লোকারণ্য।

ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করলেন হাকিম।

জুরিদের কেউ ঘুমুচ্ছে কেউ হাই তুলছে কেউ বা কাগজে হিজিবিজি আঁকছে নয়তো বিলের অঙ্ক কষছে।

জুরিরা বেশি বোঝে। তাদের জন্য ভাবনা নেই। আইনে যা করণীয় তাই করে যাও।

'যান, আপনাদের সিদ্ধান্ত এনে দিন আমাকে। যদি পারেন তো একমত হোন।' জুরিদের ছুটি দিলেন হাকিম।

এতক্ষণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল মোক্তাহার, এবার, জুরিরা চলে গেলে ভেঙে পড়ে কাঁদতে বসল।

একবার তাকাল চারদিকে। কাউকে ধরবার-আঁকড়াবার নেই। কোব্বাতের মুখখানিও কোথায় হারিয়ে গেছে।

অনেক প্রতীক্ষার পর এল আবার পঞ্চ জন। পঞ্চ জুরি।

'আপনারা একমত?' জিগগেস করলেন হাকিম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি আপনাদের সিদ্ধান্ত?'

'নির্দোষ।'

একটা স্তব্ধতার বজ্র পড়ল ঘরের মধ্যে। পি-পিতে আর হাকিমে একবার চোখ-চাওয়াচাওয়ি হয়ে গেল। যে ইনস্পেকটরের হাতে তদন্তের ভার ছিল সে হাত রাখল কপালে।

রায় দিলেন হাকিম। জুরিদের সঙ্গে একমত হলেন। যাও, জুরিবাবুরা তোমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন। তুমি খালাস।

খাঁচা থেকে নেমে এল মোজাহার। উন্মুখ দড়ি আর হাতকড়ার ঘের বাঁচিয়ে। কনেষ্টবলরা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল।

কিন্তু কোর্টের সামনে বারান্দায় এসে ফের ভেঙে পড়ল মোজাহার। কাঁদতে লাগল শিশুর মত। এক শিশু নয়, তিন-তিন শিশুর কান্না।

ভিড় জমে গেল। কাঁদবার কী হয়েছে! কেউ-কেউ বললে, আসলে যে কি হুকুম হল বুঝতে পারেনি ঠিক মত।

স্বয়ং পি পি এসে দাঁড়ালেন কাছে। ও কি, কাঁদছ কেন? ন্যায়বিচারে ছাড়া পেয়ে গেছ। আর কোনো ভাবনা নেই। ঘরে চলে যাও এবার।

যেন কোথায় ঘর এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাল একবার চার দিকে। পি-পির দু'পা আঁকড়ে ধরে বললে, আপনি তো সব জানেন, কিন্তু বলুন তো আমি কাকে মেরেছি? শহরবানুকে না সদরালিকে?

কাকে মারতে কাকে?

আসামী

ইংরেজি-বাংলা অনেক রকম বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ভীষণ জাঁকালো করে। নিজের দোহাই দিয়ে; সমাজের, সন্তানের দোহাই দিয়ে।

আগে ভাষা ছিল ভয়ের, ঘৃণার, লজ্জার—এখন হয়েছে সত্যের, সাহসের, বিজ্ঞানের। আগের আবহাওয়াটা ছিল সংক্রমণের, এখন সংশোধনের। আগে ছিল পাপ, এখন শুধু ভুল।

ভুল! কিন্তু ডাক্তার সামন্তের এটা ভুল কিনা কে বলবে।

শাদামাঠা, রোগাটে একটি মেয়ে। গরিব-গরিব দেখতে। কুমারী। হাতে এক গাছা করে সোনার চুড়ি। পায়ে সস্তা স্যাণ্ডেল।

তবু চেহারায় নম্র শালীনতা আছে। একটু বা গ্রাম্য সারল্য।

সঙ্গে লোক নেই, পূর্ব-পরিচয় নেই। সরাসর ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। খুব ভয় পেলে লোকেব এক রকম সাহস বাড়ে, মেয়েটির আবির্ভাবে সেই রকম ধৃষ্টতা।

বে-আন্দাজি কিছু বলতে পারেন না। ডাক্তার সামন্ত ক্রূর কৌতূহলে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি কি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। কেন?' সামন্ত প্রায় হুঙ্কার ছাড়লেন।

সামন্তের ধরনই এই। একটু কেঠো, সেকেলে। বাপুবাছা বলে রুগীর পিঠে হাত বুলোবার তিনি পক্ষপাতী নন। ঠেসে খুব খানিকটা আগে ধমকে নিয়ে শেষে নরম হতে পারেন। পঞ্চাশ বছর প্রায় বয়েস।

'আপনার কাছে এসেছি।' মেয়েটি চোখ নামিয়ে বললে।

'অসুখ ?'

'হ্যাঁ—'

'কার ?' তবু এখনো যেন সন্দেহের কারণ আছে !

ঘরের মধ্যে এখানে-সেখানে আরো ক'জন ছিল, মেয়েটি উত্তর দিল না।

'যান পাশের ঘরে। নার্স !'

নিরিবিলি ঘর। অনেক যন্ত্রের আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস।

নার্সের থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট নিলেন সামন্ত। ঘরে ঢুকে, প্রায় আকাশ থেকে পড়েছেন, এমনিভাবে বললেন, 'বলেন কি, আপনার নিজের ?'

টুলের উপর বসে ছিল মেয়েটি। দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

'কি সর্বনাশের কথা ! শেষকালে আপনারাও ? কি হল দেশের ?'

কান্নায় ধুয়ে যেতে লাগল মেয়েটি।

'এখন কান্নার ঢেউ তুলে তো কিছু সুরাহা হবে না। এখন আর উপন্যাস নয়, মুখ তুলুন, এখন চাই ইতিহাস। হিস্ট্রি।' অভ্যাসমত ডাক্তার তর্জন করে উঠলেন : 'কি নাম আপনার ?'

মেয়েটি মুখ তুলল। বলল, 'নির্মলা।'

'খাসা নাম ! নির্মলা ! চমৎকার নাম ! একেবারে নিষ্কলুষা।' ব্যঙ্গ ছেড়ে আবার গর্জনে এল ডাক্তার : 'বলি, পদবী নেই ?'

'নির্মলা ব্যানার্জি।'

'বাবার নাম কি ?'

'বাবা স্বর্গে।'

'স্বর্গে বলে কি নাম থাকতে নেই ?'

নির্মলা থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলল। বলল, 'বিজ্ঞাপনে বলেছে নাম ধাম সব গোপন রাখা হবে, কোথায় কিছু জানাজানি হবে না—'

কি বুদ্ধি আপনার! এমন বুদ্ধি না হলে কি আর এমন দুর্দশা হয়? নাম চেয়েছি বলে কি সত্যি নামই দিতে হবে? এর পর যখন আপনার বাড়ির ঠিকানা চাইব, চট করে কিছু একটা বানিয়ে বলে দিতে পারবেন না? হোটেলে গিয়ে যখন রুম ভাড়া নিয়েছিলেন তখন ঠিক ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন রেজিস্টারে?'

নির্মলা মাটিতে মিশে যেতে চাইল।

'থাকেন কোথায়?'

অস্বস্তিতে শুকিয়ে যেতে লাগল নির্মলা।

'না, ঠিকানা বলতে বলছি না আপনাকে। বলছি বাপ নেই বিয়ে হয়নি, থাকেন কার হেপাজাতে?'

'মামার বাড়িতে।'

'ভয় নেই, মামার নাম জিগগেস করব না।' সামন্ত ঝলসে উঠলেন: 'বলি, মামা বিয়ে দেয় না কেন?'

'হয় না—' নির্মলা আবার কেঁদে ফেলল।

অনেক হতাশা, অনেক বঞ্চনার কান্না। অনেক মনোভঙ্গের।

'হয় না, কিন্তু—' খুব একটা কঠিন তিরস্কার এসেছিল জিভের ডগায়। সামন্ত ফিরিয়ে নিলেন কথাটা।

'মামা গরিব, ছোট একটা প্রেসে কাজ করেন।'

'আর আপনি বুঝি কমিউনিস্ট?'

শোনাল একটা দুরন্ত গালের মত। চাবুকের মত।

'না, আমি কিছু না।'

'বলেন কি, আজকের দিনেও রাজনীতি ছাড়া কেউ আছে? থাকতে পারে? জানেন, আমি একজন কমিউনিস্ট?' ডাক্তার জোরালো গলায় বললেন।

'আপনি?' নির্মলা অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আমি। একভাবে না আরেকভাবে কে নয় শুনি? আমি ডাক্তারি ভাবে।'

'তার মানে?'

'মানে আর কিছুই নয়, আমাকে তার নাম বলতে হবে।'

'কার?'

'তার। যার থেকে—'

নির্মলা দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজের কোলের মধ্যে গুটিয়ে গেল। একটা শূন্য, আর্ত শব্দ করল।

'জানেন তো, সোভিয়েট রাশিয়ায় এ সব রুগীর চিকিৎসা হয় না, যতক্ষণ তার রোগের যে কারণ তার নাম না প্রকাশ করে। আপনাকে সারিয়ে সমাজের লাভ কি, যদি সে থাকে ফেরার, নিখোঁজ! আসল আসামীকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

'দরকার নেই।'

'সে যদি একা মরত, দরকার না থাকতে পারত। কিন্তু সে আপনার মত আরো কত রক্ত কলঙ্কিত করবে তার ঠিক কি!'

'না, না, দয়া করুন, পেড়াপীড়ি করবেন না—'

শুধু নিজেকে বাঁচাবেন, তাকে বাঁচাবেন না, তার থেকে সমাজকে বাঁচাবেন না?' ডাক্তার মুখিয়ে এলেন।

'না, আর কিছুই জিগগেস করবেন না আমাকে। মুখে কিছুতেই সে-নাম উচ্চারণ করতে পারব না। আর কেউ বাঁচুক না বাঁচুক, আমার কিছু এসে যায় না। আমাকে যদি মেরে ফেলতে চান, তাতেও আমি রাজি।'

উৎসের পরিচয় না দিলে চিকিৎসা করা হবে না এখনো এ নিয়ম হয়নি এ দেশে। তাই অস্বস্তি থাকলেও ডাক্তার সামন্ত নির্মলাকে বিদায় করে দিতে পারলেন না।

ফ্লাস্ক, সিরিঞ্জ আর টিউব নিয়ে নার্স এল।

'ওদিকে মুখ ফেরান। হাত মুঠো করুন। এসেছেন কিসে?'

'ট্যাক্সিতে।'

'সঙ্গে কেউ নেই?'

'না।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে নেই রাস্তায়?'

'না।'

'রাগ করবেন না। যদি থাকে, তাকে পাঠিয়ে দিন। তাচ্ছিল্য করার মত জিনিস নয়। বোমার চেয়েও সাংঘাতিক।'

'সাবধান হয়ে নিজের কাজ করুন।'

'করছি। বাড়িতে টের পায়নি?'

'না।'

'যখন পাবে?'

'পাবে না। তা না হলে আপনার কাছে আসব কেন?'

'কেউ টের পাবে না, আর টুপ করে ভালো হয়ে উঠবেন, এই চান?'

'কে না চায়!'

'কিন্তু ব্লাড-রিপোর্ট না পাবার আগে ফোঁড়াফুঁড়ি শুরু করা যাবে না। তত দিনে—'

'দিন ঠিক করে দিন, আমিই আবার আসব। যে করে পারি।'

'ইস, আজকাল লোকে কত মহৎ কাজে রক্ত দিচ্ছে, আর—ওকি, কাঁপবেন না, এই হয়ে গেছে।'

কাঁচের চোঙে অনেকগুলি কাঁচা রক্ত। নির্মলার গা ঝিমঝিম করে উঠল।

'শুনুন, আপনার কিছু বলবার দরকার নেই, তাকে শুধু পাঠিয়ে দেবেন। তাকে ভালো না করতে পারলে, শুধু আপনাকে ভালো করে, আমার শান্তি হবে না।'

'আমি কবে আসব?'

দিন বলে দিলেন সামন্ত। বললেন, 'যদি পারেন তাকে সঙ্গে নিয়েই আসবেন।'

আস্তে-আস্তে চলে গেল নির্মলা।

তারপর থেকে যারা-যারা পুরুষ এসেছে, সামন্ত খুঁজেছেন সেই আসামীকে। ঠিক ধরতে পারেন নি। সন্দেহ দানা বাঁধতে না বাঁধতেই ভেঙে পড়েছে।

কিন্তু, আশ্চর্য, দিনের পর দিন নির্মলার দেখা নেই।

ব্লাড-রিপোর্ট পজিটিভ। জোরালো। আর দেরি করা চলে না।

কিন্তু সেদিন একটা কোন এল বাড়িতে। এখুনি যেতে হবে। সামন্ত ভাবলেন, নির্মলা বুঝি বা। কিন্তু না, পুরুষ, সুধাংশু না হিমাংশু সরকার। তবু কেন কে জানে, ভাবলেন, ধরতে পেরেছে হয়তো।

ফ্ল্যাট-বাড়ি, ধাঁজটা বড়লোকি। চলতি রেওয়াজ অনুসারে সব গোছগাছ করা। প্যান্সি আর বিগোনিয়া ফুটে আছে টবে, বারান্দার রেলিঙে। হাওয়ায় কেমন যেন বিষের ছোঁয়াচ।

আশ্চর্য, গৃহস্বামী কই? কেমন যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয়ে লজ্জায় এগুতে সাহস পাচ্ছে না।

'আপনিই মিস্টার সরকার?'

উনত্রিশ-ত্রিশ বছরের যুবক। তবু মুখের দিকে পুরোপুরি তাকাতে পাচ্ছে না। অপরাধীর মত অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল শুধু, 'হ্যাঁ।'

'রুগী কই? আপনিই।'

'হ্যাঁ। আসুন।'

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে এল। কিন্তু মুহূর্তে পাথর হয়ে গেলেন সামন্ত। খাটের উপর ফিটফাট বিছানায় চুপচাপ শুয়ে একজন মহিলা। আর, সন্দেহ কি, নির্মলা!

বিস্ময়টা এইখানেই শুধু নয়। নির্মলার সধবার সাজ। হাত-ভরা সোনার চুড়ি। সিঁথিভরা নতুন সিঁদুর।

'এ কে?' প্রায় ধমকে উঠলেন সামন্ত।

'আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী?'

হ্যাঁ, বেশি দিন নয়, এই কয়েক মাস তাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর অনেক জায়গা ঘোরাঘুরি করে এই দু' মাস তারা কলকাতায়।

ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নির্মলা হাসল। ম্লান হাসি। সামন্ত দেখলেন, সে-হাসিতে শান্তি আর শুভ্রতা মিশে আছে একসঙ্গে।

হঠাৎ সামন্তের চোখের সামনে থেকে একটা মোটা পর্দা উঠে গেল। ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর আর দেরি হল না।

নির্মলার প্রতি এখন কেমন তাঁর মায়া করতে লাগল। আগে যদি বা তার মাঝে দেখেছিলেন তিনি কদর্যতা, এখন দেখেছেন মহিমা। আগে পাপীকে অপ্রকাশ রাখার মাঝে দেখেছিলেন যদি বা দুর্বলতা, এখন দেখছেন ক্ষমা, ত্যাগ, ঔদার্য।

'ওঁকে দেখুন।' বললে হিমাংশু।

'ওঁর জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওঁকে আমি দেখেছি।' ডাক্তার সামন্ত রুখে উঠলেন : 'দেখার দরকার এখন আপনাকে।'

'নিশ্চয়। রোগ রোগই। তার মধ্যে আমি কিছু তর-তম দেখতে পাইনা। যা শুধু ভুল তাকে পাপের জৌলুস দেয়ার কোনো মানে নেই।'

'রাখুন, আর বক্তৃতা দিতে হবে না।'

'এ ক'দিন কম বক্তৃতা দিতে হয়েছে? ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল নির্মলা। যেন খুন করেছে, যেন ফাঁসি গেছে, এমনি মুখের চেহারা করে ছিল ও। আমি টলিনি এতটুকুও। আগুন যখন, তখন তা নেবাতে হয়, ঋণ যখন, তখন তা শোধ করে ফেলতে হয় সমূলে। পুরোনো পাতা খসিয়ে নতুন পল্লব গজাতে হয়। আমাদের বাঁচবার বিরুদ্ধে কত রকম ষড়যন্ত্র, লোভ আর দৌর্বল্য, শাঠ্য আর অশ্রদ্ধা। তবু, সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, যতদূর সম্ভব, আমাদের স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে বাঁচতে হবে। ভুল একবার হয়,

তার জন্যে আরো কতগুলি ভুল করব এর মানে হয় না। ঘটনাটা যখন ঘটে গেছে তখন তার আর বিচার না করে প্রতিকারের পথ দেখা উচিত। না, আমি তো কিছু লজ্জা মনে করি না, রাস্তায় আছাড় পড়ে টিটেনাস হওয়াটাও তাহলে লজ্জা। রোগ যাই হোক, তাকে শিগগির সারিয়ে ফেলাটাই হচ্ছে মর্যাদাবানের ব্যবহার। অন্তত জীবন সম্বন্ধে যার মর্যাদার চেতনা আছে। জীবনে লজ্জা বলে কিছু নেই, আছে অহংকার—'

শিরালো, জোয়ান হাতে রক্ত দেবার জন্যে সরকার পাঞ্জাবির আস্তিন গুটোলো।

ফ্লাস্ক ভরে কাঁচা রক্ত টলটলিয়ে উঠল।

ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলেন সামন্ত। দু'দিন পর রিপোর্ট পেলেন। নেগেটিভ। নির্দোষ!

আকাশ

একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল সুপ্রসন্ন। এ থেকেই বোঝা যাবে সে অত্যন্ত হিসেবী, ভীরু বা কতকটা। পাঁচ চাল না এঁচে সে বোড়ে টেপে না, হাতে দু' ঘণ্টা সময় রেখে সে স্টেশনে যায় ট্রেন ধরতে, দস্তুরমতো খিদে না পাইয়ে সে ভাতের থালায় হাত দিতে নারাজ।

কিন্তু মহালক্ষ্মী একেবারে উলটো। তড়িঘড়ি কিছু একটা না করতে পারলে তার শান্তি নেই।

সুপ্রসন্নর হাতে কিছু টাকা জমেছিল, এই তার পঁইত্রিশ বৎসর বয়সে। আস্ত একটা দোতলা বাড়িও সে কিনে ফেলেছিল ইতিমধ্যে। মহালক্ষ্মীকে এই বাড়িতে এনেই সে তুললে।

বয়সের তফাৎ অনেকটা—পঁয়ত্রিশ আর বাইশ, তা ছাড়া আজকালকার ফুরফুরে শহুরে মেয়ে—নকড়া-ছকড়া করা চলবে না। হোক দুটি মাত্র প্রাণী—ঘুঘু আর ঘুঘুনী—তবু চেষ্টার ক্রটি কবলে না সুপ্রসন্ন। সোফা-সেটি তো সামান্য কথা, হ্যামক পর্যন্ত। রেডিয়ো থেকে রেফ্রিজিরেটর। জিনিসে-জিনিসে ঘর-বাড়ি ছয়লাপ হয়ে গেল। একটা জিনিসের দরুন আরেকটা জিনিস—এমনি ক্রমাগত। স্তূপাকার।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই আহত বিস্ময়ে মহালক্ষ্মী বলে উঠল: 'আকাশ কোথায়?'

সুপ্রসন্ন প্রথমে ভেবেছিল, কোনো লোক, কারুর নাম হয়তো। কিন্তু মহালক্ষ্মী যখন সিলিঙের দিকে চোখ তুলে সঙ্কেত করল তখন তার বুঝতে বেশি দেরি হলো না শূন্যময় উর্ধ্বস্থলই আকাশের এখানে অর্থ। পর্দা-গালিচা-রেডিয়ো-রেফ্রিজিরেটর ছেড়ে হঠাৎ একেবারে একটা ফাঁকা অনস্তিত্বের দিকে নজর পড়বে, সুপ্রসন্ন অনুমান করতে পারেনি। একটু কেমন ম্রিয়মাণ দেখাল তাকে।

আসলে আকাশের দিক থেকে বাড়িটা সৌভাগ্যবান নয়। অন্ধ গলির গোলকধাঁধার মধ্যে বাড়িটা চাপা পড়ে গেছে, চারপাশে দেয়ালের ভিড়, আর জানলা যা আছে তা উন্মীলিত চক্ষু নয়, নাভিশ্বাসের নাসারন্ধ্র। অর্থাৎ, হাওয়া যদি বা এক-আধটু আসে, আকাশ দেখা যায় না।

'কই, ছাদ নেই ?' মহালক্ষ্মী এগিয়ে গেল সিঁড়ির খোঁজে।

ছাদ একটা আছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বে-আব্রু। অর্থাৎ, আশে-পাশের তেতলা বাড়ির জানলা এর দিকে চেয়ে আছে অপাঙ্গে। গা এলিয়ে চুল ছড়িয়ে শুয়ে থাকবার জো থাকবে না।

'ছাই বাড়ি।'

এইতেই বাড়িটা খারিজ হয়ে যাবে সুপ্রসন্ন ভাবতে পারেনি। বললে, 'তবু নিজের বাড়ি।'

নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি বলতে মহালক্ষ্মীর একটা চমৎকার ধারণা ছিল। সে অনেক আকাশ অনেক পৃথিবী দিয়ে তৈরি। চারদিকে অঢেল মাঠ আর অফুরন্ত আকাশ—এমনি একটা অস্পষ্ট ছবি তার মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। নিজের পকেট থেকে নগদ টাকা বের করে কিনলেও যেন এটা কিছুতেই নিজের বাড়ি নয়।

'এই একটুখানি জমি আছে বাড়ির ভেতর।' যেন ক্ষতিপূরণের ভাবের থেকে সুপ্রসন্ন বললে।

মহালক্ষ্মী অল্প একটু হাসল। দেখল, কটা পাতাবাহার, কলাবতী আর হাসনুহানার ঝাড়। গোটা কয় টবে মর-মর কটা রোগা-রোগা গোলাপের ডাল। মহালক্ষ্মীর মনে হল এ করুণ দৃশ্য দেখার চাইতে আগাপাস্তলা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলা ভালো।

'কী কেবল আকাশ-আকাশ করতে। এখন কেমন ?' চাপা গলায় সুপ্রসন্ন ধমক দিয়ে উঠল, কিন্তু গলার স্বরে ধমকের চেয়ে ভয়ের অংশই বেশি। 'এখন, যেখানে আকাশ নেই, সেখানেই

নিরাপদ। জলের নিচে, পাহাড়ের গুহায়। নির্লজ্জ আকাশকে এখন একেবারে মুছে ফেলা দরকার।'

নিচে, সিঁড়ির তলায়, দু'জনে কাছাকাছি জড়সড় হয়ে বসেছে— মহালক্ষ্মী আর সুপ্রসন্ন। আর নির্জন রাত্রি প্রেতায়িত কণ্ঠে মর্মভেদী আর্তনাদ করছে। বাজছে সাইরেন।

সুপ্রসন্নর হাতের টর্চটা টিপে মহালক্ষ্মী একবার দেখতে চাইল চারদিকের চেহারা। সুপ্রসন্ন ধমক দিয়ে উঠল: 'আলো জ্বেলো না।'

'তোমাকে একটু দেখছি। কী চমৎকার সং সেজেছ। শার্টটা গায়ে দিয়েছ উলটো, কাছা বেঁধেছ কোমরে, আর তাড়াতাড়িতে কী নিয়ে নামবে কিছু ঠিক করতে না পেরে নিয়ে এসেছ কিনা মাথার বালিশটা।'

'চুপ করো। ঐ—এখনো বাজছে!' সুপ্রসন্ন মহালক্ষ্মীর একখানা হাত চেপে ধরল।

'আচ্ছা, আধখানা পাখি আর আধখানা মেয়ে—সেই তো ছিল সাইরেন, পাহাড়ে-দ্বীপে থাকত আর সমুদ্রযাত্রীদের পথ ভোলাত গান গেয়ে। সাইরেন মানে তো মিষ্টি করে যে গায়, ভীষণভাবে যে মুগ্ধ করে—লুব্ধ করে। সাইরেন কখনো এমন করে কাঁদে না বুক চাপড়ে।'

'চুপ করো। এখন কবিত্ব করবার সময় নয়।'

'তবে কি নাম জপ করবার সময়?' মহালক্ষ্মী উচ্চরোলে হেসে উঠল।

এমন অসময়ে কেউ হাসতে পারে সুপ্রসন্ন ভাবতে পারত না। বিরক্ত হয়ে সে ভেঙচিয়ে উঠল: 'কি হাসছ বোকার মতো?'

'কেন শত্রু শুনতে পাবে বুঝি?'

'তা কে কী বলতে পারে!'

'উঃ, কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খাওনি কেন এতদিন? একবারেই তো শুধু মরবে তবে চেহারাখানা এমন চোর-ছ্যাচোড়ের মতো করে রেখেছ কেন? মুখের এমন একখানা ভাব করেছ যেন স্ত্রী বেরিয়ে গেছে।' মহালক্ষ্মী আবার আরেকটা হাসির ঢেউ তুলল। বললে, 'অত চমকাচ্ছ কেন হাসি শুনে! শুনুক না ওরা কান পেতে। বুঝুক, দুঃখে ও দুঃসময়েও আমরা হাসতে পারি।'

আবার আরেকটা শব্দ—একটানা। সুপ্রসন্নর বুকের দ-টা ভরাট হয়ে উঠল। বললে, 'অল ক্লিয়ার।' জ্বালাল আলো, খুলল জানলা। নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকল বাথরুমে।

ঘুমের মধ্যে থেকে উঠে গিয়েছিল তারা। এখন ফের শুতে এসে দেখে, মহালক্ষ্মী নেই।

মহালক্ষ্মী ছাদে উঠে এসেছে, যতটুকু পারে আকাশকে একবার চোখাচোখি দেখবার জন্যে। মাঝরাতে রাস্তার সমস্ত আলো যে নিবে যায় তা তার জানা ছিল না, তাই যা সে এখন দেখলে প্রথম পুরুষস্পর্শের রোমাঞ্চের চেয়েও তা বিস্ময়কর। কলকাতায় জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। যেন বিশ্বাস করা যায় না এমনি অতুলনীয়া কলকাতা। কোথাও এতটুকু আলোর ছিটেফোঁটা নেই, শব্দের নামগন্ধ নেই, শুধু স্তব্ধতা আর জ্যোৎস্নার ঢালাঢালি। আশে-পাশে বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে, যেন নীল সমুদ্রে ভাসছে কতগুলো নির্জন জাহাজ। নিরাশ্রয় আকাশের নিচে। একটু ভয় এসে মিশেছে বলেই যেন খুলেছে। প্রত্যেক অনাবৃতির মাঝেই তো এমনি একটু ভয়।

আশে-পাশের বাড়ির জানলা দরজা সব এঁটে বন্ধ করা, আকাশের ভয়ে। যে আকাশের জন্যে আগে লোকে দেয়াল ভেঙে ফেলেছে সেই আকাশ ঢেকে ফেলবার জন্যে গাঁথছে এখন পাঁচিলের থাক, তুলছে ছাদের আচ্ছাদ। আকাশের ভয়ে সেঁধোচ্ছে মাটির অন্ধকূপে; গর্তে, খাদে, নর্দমায়। পালাচ্ছে অতলে-বিতলে। আকাশকে নীরন্ধ্র অন্ধ করে দাও এই হচ্ছে আজকের কাকুতি। যে

আকাশে ছিল ক্ষমা ও শান্তি, বিস্মৃতি ও বিশ্রাম, সেই আকাশে আজ জিঘাংসার জিহ্বা উঠেছে লালায়িত হয়ে। আকাশ নিজে কাঁদছে বলেই জানা ছিল কিন্তু সে উলটে কাঁদাবে এ কে জানত।

তবু কি মনে হয় না আকাশের দিকে চেয়ে, যে, ভয় নেই?

পিছনে হঠাৎ জুতোর আওয়াজ শুনে মহালক্ষ্মী চমকে উঠল। আর কেউ নয়—সুপ্রসন্ন। এমনভাবে মহালক্ষ্মীর হাত টেনে ধরল যেন সে এখুনি জলে পড়ে যাচ্ছে।

'তুমি কি পাগল না ইডিয়ট? খোলা আকাশের নিচে আছ দাঁড়িয়ে?'

খোলা আকাশ যেন শুধু বজ্র দিয়েই তৈরি, সুপ্রসন্নর এমন ভঙ্গি।

হাত ধরে নিচে টেনে নিয়ে গেল মহালক্ষ্মীকে। বাড়িটাতে আকাশাংশ যে কম, তারই প্রশংসায় সুপ্রসন্ন এখন পঞ্চমুখ। চারদিকে দেয়ালের আড়াল থাকাটা যে কতখানি আশ্বাসের কথা তাই সে এখন বোঝাতে লাগল প্রাণপণে। সায় না দিয়ে উপায় নেই মহালক্ষ্মীর। কিন্তু তাই বলে ঘরের জানলাগুলোও নীরন্ধ্র করে রাখতে হবে এতটা সে আয়ত্ত করতে পারত না।

'বলা যায় না, হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে দুরে-দূরে। কে জানে, ফের এসে পড়বে এখুনি।'

অমন গাম্ভীর্যের সামনে স্তব্ধতা ছাড়া আর সমস্তই বাচালতা। আর সমস্তই সর্বনাশ, ছাড়া এই অন্ধকার আর অন্ধকূপ, এই ইঁদুরের গর্ত।

আধো তন্দ্রার মাঝে, সুপ্রসন্ন হঠাৎ ছিটকানো স্প্রিঙ-এর মতো সবেগে লাফিয়ে উঠল। কাছেই কোথাও একটা ভীষণ শব্দ হয়েছে।

'নির্ঘাৎ সুরু হয়ে গেছে। বলিনি তখন?' বলতে-বলতে বিস্তৃত কাপড়টা রাশীভূত করতে-করতে সুপ্রসন্ন অধঃশ্বাসে নিচে নেমে গেল।

না, আর শব্দ নেই। দুই হাতে মহালক্ষ্মী কাঠের জানলার পাল্লা দুটো সবলে খুলে দিয়েছে, তারই সশব্দ আঘাত বেজেছে দেয়ালে। অনেক গবেষণা করে সুপ্রসন্ন বুঝল এবং ততক্ষণে মনে পড়ল মহালক্ষ্মীকে ফেলে সে একাই চলে এসেছে।

একটা ফেরিওলা হাঁকে না, রিক্সাওয়ালা একটারও ঘণ্টা শোনা যায় না এমনি ভূতে-পাওয়া দুপুর। আশে-পাশের বাড়ির জানলাগুলো নিষ্ঠুর কাষ্ঠময়, ছাদে-রেলিঙে নেই শাড়ি শেমিজ বা কাঁথা-পেনির লেশমাত্র ত্যক্তাবশেষ। রাস্তায় গাড়ি যা-ও যাচ্ছে সব ইষ্টিশানের দিকে, আষ্টেপৃষ্ঠে ভারাক্রান্ত হয়ে। পলায়মান জনতা।

'একি, তুমি এখনো যাওনি এখান থেকে ?'

কণ্ঠস্বর শুনে মহালক্ষ্মীর বুকের মধ্যিখানটা শিউরে উঠল, অনেক দিন, এমন কি বিয়ের পরেও অনুভব করেনি এমন শিউরনো। একটুখানি ভয় মেশানো না থাকলে কোন রোমাঞ্চেই তেজ থাকে না।

আর কেউ নয়, জলধি। বেঁটে, ফর্সা, মজবুত চেহারা—চোখে সেই দৃষ্টি যা কোথাও ধাক্কা খায় না, হাড় পর্যন্ত বেঁধে ; চোখে সেই দৃষ্টি যার অন্তভাগ বাণের ফলার মতো।

এতটা ভাবতে পারেনি মহালক্ষ্মী।

'কী আশ্চর্য! এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময়ও তুমি বসে আছ এখনো ?' জলধি বারন্দায় দু' পা এগিয়ে এল।

ভিতরে ভয় পেলেও মহালক্ষ্মী তা বুঝতে দিল না। কলতলায় বসে যেমন-কে-তেমন বাসন মাজতে লাগল। স্মিতমুখে বললে, 'ভয়ঙ্কর বিপদ কি একা আমার ? তোমার নয় ?'

জলধি অর্ধেক হাসল। বললে, 'আমি তো নিজেই ভয়ঙ্কর। আমার আবার ভয় কিসের ? আর, তুমি তো মহা-লক্ষ্মী।'

'এক কালে ছিলাম।'

'এক কালে ছিলে মানে?' জলধি একটু থতমত খেল: 'এখন বদলেছ নাকি?'

'সম্পূর্ণ। এখন হয়েছি মহাকালী।' মহালক্ষ্মী হাসল না, গম্ভীর হয়ে বললে।

জলধি একটু-বা অস্বস্তি বোধ করল। পাইচারি করে নিল একটু। বললে, 'তোমাকে এমন অবস্থায় দেখব ভাবিনি। খসখসের বেড়া টাঙিয়ে শীতলপাটিতে নিটোল শুয়ে থাকবার দুপুরে কলতলায় বসে ছাই আর শালপাতা দিয়ে বাসন মাজছ এ দৃশ্য তোমার স্বামী বরদাস্ত করতে পারছে?'

'না করে উপায় কী? চাকর-ঠাকুর সবাই যে পলাতক।'

'রাঁধতেও হচ্ছে নাকি দুবেলা?'

'নিশ্চয়। জমাদারের দেখা নেই, নর্দমা পর্যন্ত সাফ করছি।'

'এতদূর! তোমার স্বামী তো বেজায় স্বার্থপর দেখছি।'

'বা, উনি কী করবেন?'

'কী করবেন মানে? আমি হলে তোমাকে তোমার দাদার কাছে লাক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দিতাম আর নিজে গিয়ে উঠতাম কোনো হোটেলে। এমনি বিপদের দিনে একলা তোমাকে ফেলে রাখতাম না —এত কষ্ট আর কদর্যতার মধ্যে।'

'বা, তা হলে তো ওঁকেই আমি স্বার্থপর বলতাম।' মহালক্ষ্মী হাসল।

'সে কি? কেন?'

'বা, আমি বুঝি যুদ্ধ করব না একটুও? আমিই বুঝি শুধু মরতে ভয় পাব?'

জলধি নাকের একপাশে দুটো রেখা ফেলে একটু হাসল। বললে, 'এই বুঝি তোমার যুদ্ধ করার নমুনা? এই বাসন-মাজা?'

'হ্যাঁ, হাতা আর খুন্তি, ঝাঁটা আর বুরুশ—এই আমার এখনকার অস্ত্র।' হাত ধুয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে মহালক্ষ্মী উঠে দাঁড়াল: 'অস্ত্র আমার নির্ভীক মেরুদণ্ড।'

'তারপর দাঁত আর নোখ তো আছেই ?' জলধি শব্দ করে হেসে উঠল যাতে হাসির চেয়ে শব্দই বেশি।

'হ্যাঁ, আছেই তো।' মহালক্ষ্মী দৃঢ় গলায় বললে, 'আরো অনেক কিছু আছে। খাবারে বিষ দিয়ে রেখেছি, জলে রোগের বীজ, আশ্রয়ে আগুন—শত্রুকে ঘেঁষতে দেবনা কাছে।'

'এই রোদ্দুরে তবে এক গ্লাশ জল চাইলে তুমি বিষ দেবে আমাকে ?'

অটল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে মহালক্ষ্মী বললে, 'তুমি কি আমার শত্রু ?'

'এখন তো অন্তত তাই ভাবাই স্বাভাবিক—তোমার বিয়ের পর

'তাই যদি স্বাভাবিক, তবে এলে কেন ?'

'আগে এসেছিলাম কেন এক দিন ?

চোখ নামিয়ে মহালক্ষ্মী বললে, 'সে-কথা ছেড়ে দাও।'

'আমি কিছুই ছেড়ে দেবনা, অনেক জায়গা ও অনেক সময় নিয়ে আমি বাঁচি, তোমাদের মতো এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্তে বায়ু-পরিবর্তন করি না।'

'স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে বায়ু-পরিবর্তনে দোষ কী ?' মহালক্ষ্মীর পরিহাস যেন উপহাসে এসে দাঁড়াল।

'কিন্তু উন্নতি তো কই দেখছি না কিছু। সেদিনো তোমাকে যা দিতে চেয়েছিলাম, মনে হচ্ছে, আজো, বিয়ের পরেও সেই, জিনিসেরই তোমার দরকার।

'কি ?'

'মুক্তি।' জলধি নির্বিকল্পভাবে বললে।

'মুক্তি !' মহালক্ষ্মী কৌতুক বোধ করল।

'হ্যাঁ, ভেবে দেখ, প্রথম যৌবনের কথা—সমুদ্রাম্বরা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম, অবকাশহীন আকাশের স্বপ্ন। মনে নেই ?'

'একটু-একটু আছে হয়তো।' নিঃসঙ্কোচে বললে মহালক্ষ্মী।

'থাকবার কথা। সেই স্বপ্ন দেখতে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছিলে তুমি। ঝড় উঠল আকাশে, সমুদ্রে ঢেউ। এলোমেলো একটা গোলমেলে কাণ্ড। আমি চলে গেলাম ইউরোপ আর তুমি ঢুকলে এই খোপে, ইঁটের খোঁড়লে।'

'এই তো এক রকম মুক্তি পেয়ে গেছি এত দিনে।'

'না, আবার তোমাকে আমি চৌকাঠের বাইরে নিয়ে যেতে এসেছি। এই ছোট আকাশ থেকে অপর্যাপ্ত আকাশে, চেনা থেকে আশ্চর্যে। জলধির দুই চোখ জ্বলতে লাগল: 'আজো তেমনি ঝড়, উথল-পাথল। চমৎকার বিশৃঙ্খলা, আর এই আমার সুযোগ। সেই সুযোগে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। উঃ, এখন যদি কিছু একটা ঘটে।' জলধি নির্ভুল এগিয়ে এসে মহালক্ষ্মীর হাত ধরল: 'যদি চারদিকে একটা তোলপাড় পড়ে যায় —'

মহালক্ষ্মী হাত ছাড়িয়ে নিল না, স্নিগ্ধ হেসে বললে, 'যতক্ষণ না ঘটছে—'

'সে অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ ধরেই আমি অপেক্ষা করছি, কিন্তু আর পারলাম না থাকতে।'

'যাই কেননা ঘটুক আমি টলব না, ঠিক থাকব।'

'সাধ্য কী তুমি ঠিক থাকো?'

'বেশ তো, তখন না-হয় ভেসে পড়া যাবে তোমাকে ভেলা করে। যতক্ষণ না ঘটছে', মহালক্ষ্মীই জলধিকে আকর্ষণ করল: 'ততক্ষণ বোসো না চুপচাপ। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। কিছু খাবে? অন্তত এক গ্লাশ জল?'

কেমন সন্ত্রস্তের মতো তাকাল জলধি। সন্দিগ্ধ চোখে লক্ষ্য করল মহালক্ষ্মীকে। এখনো সে খায়নি, স্নান করেনি, ঘরের কাজকর্ম এখনো অনেক পড়ে আছে। তার রুক্ষতাটা যেন কিসের ভূমিকা।

কেমন যেন ছেদ পড়ে গেল। জলধি নিজেই হাত ছাড়িয়ে নিলে। বললে, 'আচ্ছা, আমি এখন যাই। আবার আসব।'

'এসো কিন্তু।'

ঘটনাটা সামান্যই, বিশেষত্ববর্জিত। কক্ষস্খলিত হয়ে দু'জনে একদিন খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল, জলধি আর মহালক্ষ্মী, উঠেছিল একটা ঘোরতর উপপ্লব—এক গ্রহ যদি আরেক গ্রহের সংসক্তিতে চলে আসে—তেমনি। প্রতিসাম্য বজায় রাখবার জন্য মহালক্ষ্মী চলে এল ঘনায়তন নিভৃত আশ্রয়কক্ষে আর জলধি তেমনি তার সর্পিল সঞ্চারপথে পরিক্রমণ করতে লাগল। ভেবেছিল দূরত্ব এনে দেবে ঔদাসীন্য, বিসঙ্গ, অন্তত নিস্পৃহতা, কিন্তু জলধি চিরকাল কেন্দ্রহীন।

ফুলের বাগান এখন তরকারির খেতে রূপান্তরিত হচ্ছে, আফিস থেকে ফিরে মাটি কোপাচ্ছিল সুপ্রসন্ন। মহালক্ষ্মী এক পাশে মাটির উপর বসে।

ঘাড় ফিরিয়ে-সুপ্রসন্ন জিগেগস করলে, 'কী হয়ে এসেছে জলধি?'

'একমাত্র মানুষ যা হতে পারে।'

'কী, অমানুষ?' সুপ্রসন্ন ফের মাটি কোপাতে লাগল।

'প্রায় তাই।'

'কী চায় সে তোমার কাছে?'

'খাদ্য কিংবা জল নয়, চায় স্বয়ং আমাকেই।' মহালক্ষ্মী হাসল।

'যৎসামান্যই চায় দেখছি।' সুপ্রসন্নের চোখ মাটির উপরে নিবদ্ধ: 'কেন চায়?'

'উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। চায় আমাকে মুক্তি দিতে। চেনা থেকে আশ্চর্যে নিয়ে যেতে, বৃহত্তম আকাশের সংস্পর্শে। এখানে আমার বড়ো কষ্ট, বড়ো ভয়।'

'তুমি কী বললে?'

'আমি তাকে আসতে বলে দিয়েছি।'

'আসতে বলে দিয়েছ? কবে?'

'সময় বুঝে।'

'কখন সে-সময়? আমি জানতে পাই না?' নোয়ানো কোমর সোজা করে সুপ্রসন্ন উঠে দাঁড়াল।

'তোমার জেনে লাভ?'

'আমি তাকে রুখব, তার মুখোমুখি হব।'

'আইনের জোরে না শাস্ত্রের জোরে? না, শুধু অভ্যাস বা অধিকারের জোরে?'

'শক্তির জোরে। তুমি আমার সাহস ও স্পর্ধা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছ। যে হাতে কলমের ওপর কিছু ধরিনি সে হাতে কোদাল নিয়েছি। সাইরেনের পেছনে শুনতে পাচ্ছি এখন ক্ল্যারিয়নের ডাক।' সুপ্রসন্ন মাটিমাখা দেহে অসঙ্কোচে মহালক্ষ্মীর পাশ ঘেঁষে বসল: 'তুমি চলে যেতে চাও তো যাবে এক বন্ধন থেকে আরেক বন্ধনে, কিন্তু আমি একবাব তাকে দেখে নেব।'

'সময দেবে কি তোমাকে?' মহালক্ষ্মী তার খোঁপাটা সুপ্রসন্নর কাঁধের উপর এনে ঠেকাল: 'সে যখন আসবে সেটা নাকি তখন প্রচণ্ড দুঃসময় এবং তারি জন্যেই সে নাকি বাইরে অপেক্ষা করে আছে।'

'দরজা খুলে দেবে তাকে?'

'দরজা বন্ধ করিনি কোনো দিন। আর, চোবের মতন যে আসবে সে তো আসবে সিঁধ কেটে।'

সুপ্রসন্ন সরে বসল। ঘাসের উপর হাতের মাটি মুছতে-মুছতে বললে, 'সুখী হলাম, খোলাখুলি মনের কথা যে বলতে পেরেছ।'

'হ্যাঁ, ততখানি মুখ এতদিনে হয়েছে!' মহালক্ষ্মী হাসল মুখ টিপে।

সেই বিপর্যয়ের দিনের সূচনা হয়তো, আজ বিকেলের মধ্যে

বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে, কে জানে কোথায়। এ এলাকাটার মিলিটারির দরকার পড়েছে।

যে যাই বলুক, মহালক্ষ্মীর মন্দ লাগছে না। উদ্বৃত্ত থেকে রিক্ততায় চলে যাওয়া, চেনা থেকে আশ্চর্যে। কোথাও এতটুকু ভার নেই, ভয় নেই, পিছুটান নেই—এ একটা নতুন জন্মলাভ।

সাময়িক একটা আশ্রয়ের সন্ধানে সুপ্রসন্ন বেরিয়ে গেছে দুপুরে, এখনো ফেরেনি। কে কোথায় ছিটকে পড়ছে ঠিক-ঠিকানা নেই। তারাই বা কোথায় যাবে কে বলবে।

'আমি জানতাম তুমি আজ আসবে।' জলধিকে দেখে দীপ্তমুখে এগিয়ে গেল মহালক্ষ্মী।

'কিন্তু আজো যেন মনের মতো করে শুভলগ্ন আসেনি, লক্ষ্মী।' জলধির মুখে অসন্তোষ।

'বলো কি, আজ তো সেই বিশৃঙ্খলারই দিন। চারদিকে সব ছত্রাকার, ওলট-পালট।'

'না, আমি ধ্বংসের দিনের আশা করে বসে ছিলাম। তেমন দিনের—যে দিন তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে আঁকড়ে ধরবে।'

'সেই দিনই আজ নয় তোমাকে কে বললে?' মহালক্ষ্মী সত্যি-সত্যি জলধির হাত চেপে ধরল: 'চলো, তোমার সঙ্গেই আজ যাব। যাবার জন্যে কখন থেকে তৈরি হয়ে আছি তোমার পথ চেয়ে।'

'আমার সঙ্গে যাবে?' আশ্চর্য, জলধিও চমকায়। 'কোথায়?'

'বলেছিলে না, সেই চেনা থেকে আশ্চর্যে, বৃহত্তর আকাশের সংস্পর্শে—সেইখানে।'

'তুমি তৈরি?' দুলে উঠল জলধি।

'আপাদমস্তক।' ফণা-তোলা সাপের মতো ভঙ্গি মহালক্ষ্মীর।

পরনে মোটা শাড়ি, হাতে আর গলায় সাধারণ দু'খানি গয়না, পায়ে ভারি জুতো। চুলগুলি আঁট করে বাঁধা, শাড়ির আঁচলে

কটিতট দৃঢ়ীকৃত। যেন অনেক শ্রম অনেক হতাশা সহ্য করবার প্রস্তুতি তার চেহারায়।

'তোমার ঘর-বাড়ি?'

'কে বললে আমার?'

'তোমার জিনিস-পত্র?'

'ভার যত কম হয় ততই ভালো। শুধু এই কিছু খাদ্য আর জল নিলাম সঙ্গে।' মহালক্ষ্মী একটা হ্যাভারস্যাক কাঁধে তুলে নিল।

'তোমার স্বামী?'

'মানে সুপ্রসন্ন বাবু?' মহালক্ষ্মী চোখের তারায় ঝিলিক দিল: 'তিনি গেছেন ছাদ আর দেয়ালের সন্ধানে—এক গুহা থেকে আরেক গুহায়। তিনি চান থামতে, লুকোতে, মাথা গুঁজতে—আর আমরা চিরকালের যাত্রী। উদয় থেকে অস্ত আর অস্ত থেকে উদয়।'

'কিন্তু আমাদেরো তো থামতে হবে এক সময়।' জলধি কুণ্ঠিতের মতো বললে। 'চলো, তোমাকে লাক্ষ্ণৌ রেখে আসি, কিংবা ময়মনসিঙে আমার দেশের বাড়িতে, কিংবা দাঁড়াও, ভেবে দেখি—'

'ভেবে দেখবার সময় নেই। আশ্চর্য থেকে চেনায় ফের নামিয়ে নিয়ে এসো না, আকাশ থেকে পুরোনো সেই গহ্বরে। অসম্ভব। চলো।'

বাড়ির বাইরে চলে এসে মহালক্ষ্মী দরজায় তালা লাগাল।

বেশির ভাগ লোকই হেঁটে চলেছে, পৌটলা-পুঁটলি যা পেরেছে পিঠে বেঁধে। 'গাড়ির দাম দশগুণ—শহর থেকে শহরের উপকণ্ঠে। তাই একটা যোগাড় করলে জলধি।

'না, সকলের সঙ্গে হেঁটে যাব।'

'কোথায় হেঁটে যাবে?'

'যেখানে পা ব্যথা হয়ে ভেঙে পড়ব সেইখানে।'

'বাজে বোকো না, চলো, আজ রাতটা কোনো হোটেলে—'

'মন্দ বলো নি, খাবার আর জল সম্বন্ধে অন্তত তবে নিঃসংশয় হওয়া যায়,' মহালক্ষ্মী চোখ নাচাল : 'তার পরে নিভৃত নরম সুখ-শয্যা, অঢেল বিশ্রাম, কিন্তু বলো, আমার চেহারায় আজ কিসের স্বীকৃতি ? এই সব ঠুনকো আরাম আর ঐশ্বর্যের ?'

'তবে যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে সেইখানেই আমি যাবো।' জলধি ছেড়ে দিল নিজেকে। কেমন নিস্তেজ তার কণ্ঠস্বর।

কতদূর চলে আসতে পড়ল একটা খোলা মাঠ। কে বলে উঠল : 'এইখানে।'

ছোট একটা তাঁবু, বাইরে দু'খানা দড়ির খাটিয়া। জিনিস-পত্র বাক্সপ্যাঁটরা কিছু টাল করে ফেলা।

ডাক শুনে মহালক্ষ্মী থেমে পড়ল আচমকা। উল্লসিত গলায় বললে, 'আমরা দু'জনে হোটেলে যাচ্ছি, কিন্তু, এ কী, তুমি যে আজ একেবারে আকাশের নিচে ? চেনা থেকে আশ্চর্যে ?'

'হ্যাঁ,' সুপ্রসন্নর গলা কেমন বিষণ্ণ শোনাল : 'অন্য কোনো আশ্রয় এত অল্প সময়েব মধ্যে সংগ্রহ করতে পারলাম না। কাল দেখব আরেকবার চেষ্টা করে।'

মহালক্ষ্মী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল জলধির দিকে। বললে, 'তুমি যে-আকাশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলে সে কি এই আকাশের চেয়েও বড়ো ? দেখ দেখি চেয়ে ?' বলে বসে পড়ল সে একটা খাটিয়ায়, খোঁপাটা সংস্কার করতে লাগল।

'এ কী, এখানে বসে পড়লে ? এরি মধ্যে ?'

মহালক্ষ্মী হেসে উঠল : 'পা ব্যথা হয়ে ভেঙে পড়লাম যে। লজ্জা কী, তুমিও বোসো না ঐ খাটিয়ায়। তুমিও তো খুব ক্লান্ত, গাড়িতে চড়তে না দিয়ে যথেষ্ট তোমাকে নিস্তেজ করে এনেছি— অতএব কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো এখানে। বসে-বসে দেখ আমাদের এই আকাশ। কেমন, আশ্চর্য লাগছে না একটুও ? তোমার সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দেয়া হয়নি বুঝি? ইনি আমার স্বামী সুপ্রসন্ন আর ইনি—কী বলবো—জলধিনাথ।'

'কী আশ্চর্য, বসুন', সুপ্রসন্ন ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'ভীষণ শ্রান্ত আপনি, অনেক পথ আপনাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে। তোমার সঙ্গে জল আর খাবার আছে না? তাই দাও ওঁকে—আমি গ্লাশ আর প্লেট বের করে দিচ্ছি।'

অচেনা এলেকাতে এসে জলধি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বললে, 'ব্যস্ত হতে হবে না আপনাকে। শ্রান্তি বা উপবাসে কোনো দিন ঠকিনি, ঠকেছি শুধু ছলনা আর ছদ্মবেশে', তারপর মহালক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে: 'তা হলে আর যাবে না তুমি?'

'পা ব্যথা করছে যে!' ছেলেমানষি গলায় মহালক্ষ্মী বললে, 'তা ছাড়া এত বড়ো আকাশ আমাকে আর কে দেবে? এ আকাশ যে সত্যি আকাশ, ছদ্মবেশী আকাশ নয়।'

'কিন্তু রাত করে আকাশের নিচে থাকাটা কি আপনি নিরাপদ মনে করেন?' জলধি লক্ষ্য করল সুপ্রসন্নকে:. 'যদি সাইরেন বেজে ওঠে?'

'ওঁর হয়ে তার উত্তরটা আমি দেব।' মহালক্ষ্মী খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়াল, বললে ঋজু দৃঢ় কণ্ঠে: 'সাইরেনের পেছনে শুনতে পাই আমরা ক্ল্যারিয়নের ডাক।'

জলধি পরাভূতের মতো তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ নামিয়ে চলে গেল অন্ধকারে।

হঠাৎ যেন কে কেঁদে উঠল অন্ধকারে।

লণ্ঠনের শিখাটা খানিক আগে কমিয়ে দিয়েছিল অমিতাভ। আবার বাড়িয়ে দিল আস্তে-আস্তে।

তবু তাকাল একবার ত্রস্ত চোখে। পুব আর দক্ষিণের জানলা খোলা। তাকাল বাইরে, চার দিকে। কই, কেউ কোথাও নেই। এদিক ওদিক দুদিকের রাস্তাই কখন নির্জন হয়ে গিয়েছে। ফিরতি শেষ বাস কখন চলে গিয়েছে ডিপোয়। মুদির দোকানের আলোটাই জ্বলে অনেক রাত, তারও আয়ু শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। দূরে শোনা যাচ্ছে না আর খেয়াঘাটের ডাকাডাকি। আশেপাশের বাড়িতে কোথাও এতটুকু আলোর বিন্দুবিসর্গ নেই। ঘুমের মতন উদাসীন অন্ধকার।

আবার কান পাতল অমিতাভ। যেমন বন্ধ ঘরে কান পাতে তেমনি। ঠিক শুনল সেই কান্নার স্বর। অস্ফুট কিন্তু ছুঁচের মত প্রত্যক্ষ।

যেন কিছু বলে বলে কাঁদছে। কী বলছে বলো তো? কান খাড়া করল। আমাকে বাঁচাও। আমি বিপন্ন। আমাকে তোলো, আমাকে ধরো।

সেই কখন থেকে টেবিলের সামনে ঠায় বসে সে চেয়ারে। একবার ঘুরে দেখে আসতে হয়। অন্তত সামনের খোলা ছাদ থেকে টর্চ ফেলে আনাচ কানাচ।

আশ্চর্য, যে কাঁদছে তার চেয়ে যে কান্না শুনছে তার যেন বেশি বিপদ। বেশি ভয়।

টেবিলের টানা খুলে টর্চ বের করল অমিতাভ। নিঃশব্দে চলে

এল ছাদের উপর। রাতে ঘুম আসছে না তাই একটু বেড়িয়ে নিচ্ছে, এমনি ভাব করে খানিকক্ষণ পাইচারি করল। টর্চ জ্বেলে কাজ নেই। এমনিতেই বেশ দেখাচ্ছে। তারাজ্বলা অন্ধকারেরও আলো আছে। খানিকক্ষন চেয়ে থাকতে-থাকতে বেশ ঠাহর হয় দিকপাশ। বেশ দেখা যাচ্ছে সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে রাস্তাও ফাঁকা। ধারে-কাছে কোথাও ঝোপঝাড় বনবাদাড় নেই।

টর্চ জ্বেলে এর চেয়ে বেশি আর কী দেখা যেত। খোলা জানলা দিয়ে কারুব ঘরে গিয়ে আলো পড়লে হয়তো উঠে পড়বে। অকারণ একটা গোলমাল সুরু হয়ে যাবে। দরকার কি অন্যের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে।

কাঁদছে তো কাঁদুক। সব কান্নাই থামে। এ কান্নাও থামবে এক সময়।

কিন্তু এ খুব দূরের কান্না কি! এক সময় মনে হল অমিতাভর এ কান্না যেন তারই ঘরের মধ্যে। চমকে উঠল অমিতাভ। তার ঘরে বসে কে কাঁদবে? সবিতা তো কলকাতায়। কী জ্বরেই যে তাকে ধবল কলকাতায় না পাঠিয়ে আর পথ ছিল না। দোতলায় দুখানা তো ঘর, এই একটা বসবার আর মুখোমুখি ঐ শোবার। বাইরের দরজা বন্ধ কখন থেকে। এখানে কে আসবে? কে কাঁদবে?

তবে কি নিচে? নিচে চাকর। আর ওপাশে আর্দালিব ঘরে আর্দালি। তারা কাঁদতে যাবে কোন দুঃখে?

মুঠো-মুঠো করে ছড়িয়ে দেওয়া রাশি-রাশি জুঁই ফুলের মত গুঁড়ো-গুঁড়ো তারা—এতগুলি তারা এক সঙ্গে আর যেন কোনো দিন চোখে পড়েনি। চোখে পড়লেও দেখেনি। দেখলেও ভাবেনি। দিনের আলো নিয়ে কাজ করেছে, মুছে ফেলেছে অবান্তর তারার জঞ্জাল। এখন মনে হল সে না দেখুক, আর যেন কে তাকে দেখছে। সহস্রচক্ষু হয়ে দেখছে। বলছে, দেখে ফেলেছি। ধরে ফেলেছি। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো চুপচাপ। ঘুমোও।

অমিতাভ আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল। আলোর শিখাটা বাড়িয়ে দিল।

কান্নার শিখাটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল বুঝি। আবার শুনতে পেল তার উচ্চ তীক্ষ্ণতা। আমাকে বাঁচাও। আমার মুখ রাখো।

কি একটা অজ্ঞেয় মহাশক্তি ধরে রয়েছে তারাগুলোকে। ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটিয়ে দিয়ে কঠিন হাতে রাশ টেনে ধরেছে। একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকাঠুকি হচ্ছে না। তাও কি একটা-দুটো? একের পিঠে অগণন শূন্য বসিয়েও গুনে শেষ করতে পারেনি মানুষের অঙ্কশাস্ত্র। ছেড়ে দিয়েছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যা বুঝিনি, বোঝবার নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? এমনই নানা কারণে মাথা ঘামছে। এমনিতেই অনেক বোঝা। না-বোঝার বোঝা চাপিয়ে আর ক্লান্ত হবার দরকার নেই।

মানুষ ছাড়তে চাইলেও মহাশক্তি তাকে ছাড়েনি। যেমন আকাশে আছে তেমনি আবার বাসা নিয়েছে তার ক্ষুদ্র বুকের মধ্যে। তবু দেখছে। বোবা, তবু কথা কইছে। কাঁদছে। সন্দেহ কি, এ তার সেই বুকে-বাসা-বাঁধা অদৃশ্য মহাশক্তির কান্না।

কিন্তু দৃশ্য মহাশক্তির কান্নাও শোনো। সেই বা কম কি।

সামনের একতলা বাড়ির দিকে তাকাল আরেকবার অমিতাভ। তাকাল পরিপূর্ণ চোখে। জানলার ধারে এখনো দাঁড়িয়ে আছে হরবিলাসের বউ।

হাতে ছোট একটি লণ্ঠন। সেটা নিজের মুখের কাছে তুলে ধরেছে। নববধূর মুখের কাছে যেমন প্রদীপ তুলে ধরে তেমনি।

হরবিলাস যে বাড়ি নেই তা অমিতাভ জানে। সকালে কলকাতা গিয়েছে। যখন যায় দেখা হয়েছে অমিতাভর সঙ্গে। বাড়ির গেটের সামনে।

'কি, কদ্দূর?' জিগগেস করেছিল অমিতাভ।

'কলকাতা।'

'ফিরবে কবে ?'

'আর কবে ! কাল সকালে। কোর্ট কামাই করলে কি চলবে ?'

'দেখি —' হরবিলাসের পকেটের দিকে হাত বাড়াল অমিতাভ।

নস্যির কৌটো খুলে বাড়িয়ে ধরল হরবিলাস। অমিতাভ এক টিপ নস্যি নিল।

হরবিলাস বললে, 'একটু দেখো। চোখ রেখো।' বাড়ির দিকে সঙ্কেত করল।

এমনি রবিবার সকালে প্রায়ই যায় হরবিলাস। সোমবার ফেরে। ক্বচিৎ কখনো এক-আধ দিন দেরিও হয়।

মোক্তারি করে হরবিলাস। ঠিক মোক্তার-পাড়ায় বাড়ি না নিয়ে বাড়ি নিয়ে ফেলেছে অফিস-পাড়ায়। কিন্তু ঠিক লুপ্ত অকারের মতন থাকেনি, মিশে গিয়েছে। মিশে গিয়েছে সকলের খেজমত খেটে। বিদেশ থেকে অচেনা জায়গায় এসে কত কি অসুবিধেয় পড়ে অফিসররা, তা সব নিষ্কণ্টক করে দেয়। কার কি অভাব কার কি প্রয়োজন তার তদারক করে। এ থেকে ফেরাফিরতি সে কোনো সুবিধে চায় না, বলে, আদালত আদালত পরোপকার পরোপকার। কিন্তু চক্ষুলজ্জা এমনি জিনিস, তার খাতিরে কিছু যে নাও পায় তাও নয়। ধরিয়ে দিলে হাসে। বলে, এ আমার জোরে নয়, আমার মামলার জোরে। সত্য মামলাও তো আছে আর তার দু' একটা আমার হাতে বা কোন না আসবে !

প্রথম যখন এখানে আসে অমিতাভ, গায়ে পড়েই দেখা করতে এসেছিল হরবিলাস।

'ঠিক পাশের বাড়িতে আমি থাকি।'

গেটের বাইরে দেখা। অমিতাভ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'সে কি, আসুন, ভেতরে আসুন।'

'গেটের বাইরেই ভালো। আমি আপনার কোর্টের মোক্তার।'

মৃদু হাসল অমিতাভ। ইঙ্গিতটা পুরোনো। বাইরে মক্কেল দাঁড়'

করিয়ে রেখে হাকিমের সঙ্গে মোক্তার দেখা করতে যায় আর হিসেবে হাঃ-খঃ বা হাকিম-খরচ বাবদ একটা মোটা অঙ্ক দেখিয়ে দেয় এ একটা চলতি রসিকতা।

'সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে,' হরবিলাস তাকাল ঘাড় হেলিয়ে: 'আমাকে চিনতে পারো? আমি হরবিলাস।'

'আরে, হরবিলাস?' একবাক্যে চিনতে পারল অমিতাভ। 'তুমি?'

এক সঙ্গে পড়েছিল ইস্কুলে। কত যুগ আগে। চিনতে যে পেরেছে এই ঢের। তৃপ্তমুখে হাসতে-হাসতে চলে গিয়েছিল হরবিলাস। 'কখন কি দরকার পড়ে জানিও নিঃসঙ্কোচে।'

হরবিলাসের স্ত্রীর অমনি গেটের বাইরে থেকে চলে যাবার তাগিদ পড়েনি। তার সঙ্গে কোর্ট-কাচারির সম্পর্ক নেই। সে অন্তঃপুরের মানুষ, চলে এল অন্তঃপুরে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে। কদিন পরেই সবিতা অসুখে পড়ল, সেবা করল ছুটোছুটি করে। দুপুরবেলা কোর্টে চলে গিয়েছে অমিতাভ, কে দেখবে সবিতাকে, কে জলপটি দেবে জ্বর বাড়লে—হরবিলাসের বউ আছে। যেদিন কলকাতা যায় সবিতা, সেদিনও খাইয়ে দিয়ে গেছে নিজের হাতে।

বউটির কি যেন একটা নাম বলেছিল সবিতা। মনে করে রাখেনি অমিতাভ। হরবিলাসের বউই তার নাম। পরস্ত্রীর আবার নাম কি।

ঘোমটা-ঢাকা মুখে দু-একবার পড়ে গিয়েছিল কাছাকাছি। তারই মধ্যে এক পলকের জন্যে হলেও চোখ দুটি রেখেছিল ঠিক চোখের উপর। হৃদয়ের মধ্যেই যে অতল সাগর তা ঐ চোখ দেখলেই বুঝি বোঝা যায়। কৃষ্ণায়ত, কটাক্ষগর্ভ চোখ। কিছু বলে না ধরে ফেলে, কিছু চায় না নিয়ে নেয়, কিছু দেয় না দেবার আগেই পেয়ে গেছে বলে হাসে!

লাল রঙের শাড়ি আর গায়ের জামাটা বুঝি সবুজ। একটু সাজগোজ করেছে। লাল হচ্ছে ভয়, সবুজ হচ্ছে নিমন্ত্রণ। ভয়ের

নিমন্ত্রণ। আবার হাতে আগুন। এ কি আশ্বাস না সর্বনাশের ভস্মশেষ!

মহাশক্তি নয় তো কি? মহাশক্তি না হলে এমন পরিবেশ তৈরি হয়? চারদিক থেকে আসে এমন একটি নিঃসঙ্গসুন্দর মুহূর্ত? এমন কোমল আনুকূল্য?

কি দুর্দান্ত উজ্জ্বলন্ত সাহস! মৃদু-মৃদু হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এক হাতে লণ্ঠন তুলে ধরে আরেক হাতের আঙুল নেড়ে-নেড়ে ডাকছে। হাত নেড়ে-নেড়ে বোঝাচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই। নিজের হাতের লণ্ঠনের শিখাটা কমিয়ে দিয়ে বোঝাচ্ছে, তুমি এলেই সব অন্ধকার করে দেব। গায়ের আঁচলে একটা ঢেউ সৃষ্টি করে বোঝাচ্ছে, ঢেকে রেখে দেব সব লজ্জা। গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।

এ কে ডাকছে?

যেন ডাকছে কোন নির্জন সমুদ্রতীর, নিষ্প্রবেশ অরণ্য, গহন গিরিগুহা। যেমন রক্তকে ডাকে ছুরি, মাটিকে ডাকে ভাঙনের নদী, ফলের নিগূঢ় রসকে ডাকে সূর্য।

শোনো। যেও না। বিচার করে দেখ তুমি কে। তুমি এ মহকুমার সেকেণ্ড অফিসর। কত বড় সম্মানের, দায়িত্বের পদে বসে আছ। যদি জানাজানি হয়ে যায় কান কাটা যাবে। সমাজ-সংসারে মুখ দেখাতে পারবে না। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজনের মুখ ছোট করে দেবে। শুধু তাই নয়, চাকরি চলে যাবে। তারও চেয়ে বেশি, জেল হয়ে যাবে। শোনো। বিচার করে দেখ।

বিচার?

এত বিচার করছ আর এ বিচার করতে পারবে না?

বিচার থাকে না। বিচার পচে যায়। যে রসময় গৃহীকে সন্ন্যাসী হতে ডাকে তারও এই ডাক। এই হাতছানি। বীরকে ডাকে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে, রাজার ছেলেকে চীরবাস পরতে, বিষয়ীকে পথের ভিক্ষুক হতে। সেও এই ডাক। এই হাতছানি।

ভগবান! ভূমা! পাপ! পরস্ত্রী! একই সেই দুর্নিবার আকর্ষণ! একই সেই দুর্মোচ্য রহস্য! একই সেই ভীষণসুন্দরের ডাক।

বিচার করবে না তো, বিদ্যাবুদ্ধি কিসের জন্য? আত্মসংযম করতে পারবে বলেই তো যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য। অন্তত আইন-কানুন। শোনো। লেখাপড়া শিখেছ বলেই সমাজ তোমাকে আরো বেশি দায়ী করবে, দোষী করবে।

মৃত্যুকে কে দমন করতে পারে? কে দমন করবে অপ্রতিরোধ্যকে?

কিন্তু বিপদের কথাই বা ভাববে না কেন? কে জানে এ হয়তো একটা ফাঁদ; তোমাকে বিপাকে ফেলবার চক্রান্ত। মানসিক গ্লানি তো আছেই, কে জানে হয়তো শারীরিক আঘাতই পেয়ে যাবে একটা। কাছে-পিঠে হয়তো হরবিলাসই কোথায় লুকিয়ে আছে। মাথায় লাঠি মেরে বসবে কিংবা ছুরি। এ বিপদটাও তো ভাবা উচিত।

কেউ ভাবেনি। আগুনে দগ্ধ করেছে, শূলে বিদ্ধ করেছে, কুঠারে ছিন্ন করেছে! কেউ ফিরেও তাকায়নি। সে মহামহিমের ডাক এসে পৌঁছলে কেউ পারেনি হিসেব মেলাতে। সে জীবনসর্বস্বের কাছে বিসর্জন দিয়েছে সব প্রিয়বস্তু।

কিন্তু এ একটা কে!

মানি না। চিনি না। কেউ জানে না, কেউ চেনে না। শুধু এইটুকু জানি সে ডাকে। মহামনুষ্যলোকে সে এক দুর্বারণ ডাক। এক দুঃসাধ্য প্রলোভন।

কোথায় ভগবান, কোথায় পরস্ত্রী!

ঐ দেখ, নিজের থেকেই দরজা খুলে দিয়েছে আধখানা। নিজেকে আধখানা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তের ছায়ামূর্তি হয়ে।

যদি কাছে গিয়ে পড়ি, কী না জানি কথা বলবে প্রথম সম্ভাষণে! মৃত্যু যখন গলা জড়িয়ে ধরে পরিপূর্ণ মমতায়, কী বলে ডাকে, কি কথাটি প্রথম উচ্চারণ করে! না কি কিছুই বলে না! না কি নিবিড় চুম্বনে রক্তিম অধর শুধু পাণ্ডু করে দেয়!

বুকের মধ্যে বসে অমন নাকি সুরে তুমি আর কেঁদো না। অজানা এক রোমাঞ্চের খবর এসেছে জীবনে, যদি আসে নিতে দাও। এর চেয়েও যদি বড় রোমাঞ্চ কিছু থাকে, নেব, বঞ্চিত করব না নিজেকে।

কিন্তু এ তো তোমার রিপু।

কে জানে রিপুই আবার মিত্র। বিপথই আবার পথমুক্তি। তুমি যখন হেরে যাচ্ছ তখন হেরে যাও। তোমার চেয়েও ঐ আকর্ষণ অদম্য। সুতরাং হেরে যাও। পথ ছেড়ে দাও। ভয়ে বা লোভে আমাকে নিরস্ত কোরো না।

তবে এক কাজ করো। ধীরে ধীরে এগোও। ভাবখানা দেখাও হাওয়া খেতে বেরিয়েছ। এমনি দেখতে পেলে হঠাৎ, খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রমহিলা, যেন কি সাহায্যের আশায়, তুমি কৌতূহলী হয়ে জিগগেস করতে গেলে, কি ব্যাপার? শুধু এই একটু অভিনয়। তার মানে, একটু কথা কয়ে নিলে বাইরে থেকে। বুঝতে পেলে পরিবেশটা। যদি বুঝলে নিরাপদ, ঢুকলে। যদি বুঝলে গোলমাল আছে, কেটে পড়লে।

তোমার দ্বিধাকে বলিহারি। ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। তীর যেমন লক্ষ্যের দিকে ছোটে তেমনি ছুটব। শরবৎ তন্ময় হব। বেগ না থাকলে রোমাঞ্চ কি? সহসা-অভাবনীয়কে নেব বুক ভরে। বিপদ না থাকলে কী সুখ সুখ পেয়ে!

কিন্তু তুমি তো ঠিক জানো না কেন ও দাঁড়িয়ে আছে দুয়ার আড়াল করে।

আর জানতে বাকি নেই।

এমনও হতে পারে আর কারু জন্যে।

তাই দ্বিধা করবার সময় দেব না। সেই উৎফুল্ল পুলকোচ্ছ্বাস নেব অপরিমাণ অসঙ্কোচে। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে সেই ত্বরায়। হয়তো এমন রাত আর আসবে না। এমন ডাক আর শুনব না জীবনে।

লণ্ঠনের আলোটা বাড়ানোই থাক। যদি কেউ এদিকে তাকায় ভাবতে পারবে বেশি রাত-জাগা মানুষ কাজ করছে এখনো।

ও আলোটা জাগা থাক। ঘরে ফিরিয়ে-আনা নিরাপদ আশ্বাসের মত। আর, যদি সব যায় তো যাক। আমি তো জোর করে যাইনি গায়ে পড়ে। আমাকে টেনেছে, ডেকেছে, পথ ফুলমসৃণ করে দিয়েছে, তাই গিয়েছি। এখন যদি আর না ফিরি তো না ফিরব।

শেষ শৃঙ্গে উঠেছে অমিতাভ। এর পরেই শূন্য।

ছোট্ট মাঠটুকু পেরিয়ে পৌঁচেছে হরবিলাসের বাড়ির কিনারায়। দরজার আড়াল থেকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হরবিলাসের বউ। সোনার চুড়ি-ভরা সুগোল মণিবন্ধ।

পুরোনো আমলের একতলা বাড়ি। রোয়াক নেই। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়েই ঘর।

হঠাৎ অমিতাভ আবিষ্কার করল তার পায়ে স্যাণ্ডেল। চুরি করতে এসেছে তবু সম্ভ্রান্ত হবার কথা ভুলতে পারিনি। কি করবে, এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। একটি মুহূর্তের দীর্ণ-অংশও দেরি করবার সময় নেই। সিঁড়ির শেষ ধাপের নিচে ঘাসের উপর জুতো খুলে রেখেই উঠতে লাগল। মনে হল মন্দিরে উঠছে, এখানে মানাবে না জুতো। পাপের রমণীয় মন্দির।

হরবিলাসের বউ চাপা গলায় বলে উঠল, 'জুতো—'

সত্যিই তো। জুতো খুলে রেখে কেউ উঠে আসে? যদি কেউ নিয়ে যায় হাতে করে, সরিয়ে ফেলে? প্রমাণের তবে আর বাকি থাকবে কি? আলামত হয়ে যাবে। একজিবিট হবে কোর্টে।

জুতো পরতে নামল ফের অমিতাভ।

হরবিলাসের বউ বলে উঠল ব্যাকুল হয়ে, 'ও থাক, থাক। সব আমি ব্যবস্থা করছি! কোনো ভয় নেই, ও আমি পৌঁছে দেব। আপনি আসুন। আসুন।'

আর কে থামে। জুতো পরে সটান ফিরে এল অমিতাভ। মনে

হল কে যেন সবলে তার গায়ের উপর জুতো ছুঁড়ে মেরেছে। সে কি হরবিলাসের বউ না আর কেউ ?

আর কোনো দিকে তাকাল না। সদর খোলা রেখে এসেছিল, বন্ধ করল। উপরে উঠে বন্ধ করল জানলা দুটো। আলো নেবাল। শোবার ঘরে এসে মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ল আলগোছে।

সব ঠিক আছে

বেয়ারা কার্ড নিয়ে এল পিতলের থালায় করে।

টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে জিকি মিত্তির ইংরিজি নভেল পড়ছিল। আসল নাম জে, কে মিত্তির। সংক্ষিপ্ত সোহাগে স্ত্রী ডাকে জিকি বলে। তাই থেকে বাজারে জেকেব বদলে জিকিরই জাঁক বেশি।

পরনে শর্টস, পা দুটো উঁচুয় তুলে দেয়ার দরুন এখন আরো হ্রস্ব দেখাচ্ছে। গায়ে ঘরে ঘরে দড়ি-বাঁধা খেলোয়াড় গেঞ্জি। মুখে বাঁকা করে ধরা ক্রুদ্ধ পাইপ। বই পড়ছে বটে, কিন্তু ভঙ্গিতে অভিনিবেশের নম্রতা নেই। বই পড়ার সময়েও রাজকীয় ঔদ্ধত্যটা বজায় রাখতে হবে। সেটা রক্তের রক্ত, মজ্জার মজ্জা।

কার্ডে দেখল একজন নিরীহ সাধারণ লোক, পদের উল্লেখ নেই যখন, নিশ্চয়ই অপদস্থ।

বেযারা একটু দ্বিধা করল হয়তো, ডাকবে কি ডাকবে না। সাহেবের মুখে কি ইঙ্গিত ভেসে ওঠে।

'ফিরিযে দিই ?'

'না,'ঠিক আছে। ডাকো।'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে ওঠবার বড় সাধ হচ্ছিল জিকি মিত্তিরের। আজ রবিবার, অফিস নেই। সারাদিন তাই এক-আধটু খেঁকিয়ে উঠতে না পারলে গা-টা কেমন ম্যাজম্যাজ করে, শরীরে রক্তচলাচল ভালো হয় না।

বুড়ো মতন ভদ্রলোক, গায়ে কুঁচকানো সিল্কের কোট, পায়ে ক্যাম্বিশের খড়ি ওড়ানো জুতো। সদ্য দাড়ি কামিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কানের লতিতে সাবানের ফেনা। সম্ভ্রান্ত হতে চেষ্টা করলে কি হবে, কেমন হতচ্ছাড়া চেহারা।

লোকটা মুখ-চেনা। তাঁত-চরকার কি একটা আশ্রম চালায়। হয়তো আসলে চলে না।

কামড়ানো পাইপের পাশ দিয়ে বাঁকা আওয়াজ বেরুল 'কি চাই ?'

দাঁড়াও, আগে আনত হয়ে দীর্ঘ প্রণাম করি, চেয়ার টেনে পাশে বসি, তুমি পা ছুটো নামিয়ে ভদ্র হও, স্বাভাবিক হও, পরে ধীরেসুস্থে পেশ করি আমার বক্তব্য।

না, অত সময় নেই।

'কি চাই ?' জিকি মিত্তিরের জুতোর ডগাছুটো টেবিলের উপর ঘন ঘন নড়তে লাগল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে সে কথার অর্থ কি স্পষ্ট হবে ? একটু বসি।

'না, বসবেন না। বসে গল্প করবার মত আমার সময় নেই।'

সুতরাং ভদ্রলোককে বলতে হল। সবই সংক্ষিপ্ত, তাই বক্তব্যও সারতে হল অল্প কথায়। বসতে পারলে একটু ইনানো-বিনানো চলত। আনা যেত কাতরতার ভঙ্গি। একটা করুণ আবহাওয়া।

'বেয়ারা!' ঝিকিয়ে উঠল জিকি মিত্তির।

আঁতকে উঠে ঢোঁক গিলল ভুপেনবাবু। বললে, 'চলে যাব ?'

'চলে যাবেন না তো হাঁদার মত দাঁড়িয়ে থাকবেন ?' জিকি মিত্তিরের শরীরে রক্তচলাচল সুরু হল বোধ হয়।

'কিন্তু যদি ছু লাইন একটু লিখে দেন আমার চাকরিটা হয়।' দাঁড়ানো অবস্থাতেই ভদ্রলোক যতটা সম্ভব বিনয়ের তরলতা আনল: 'শুধু ছু লাইনের একটা লেখা।'

'লিখে দেব ? মিথ্যে কথা লিখে দেব বলতে চান ?' গায়ের ম্যাজমেজে ভাবটা সেরে যাচ্ছে জিকি মিত্তিরের। পাইপের মুখটা হাতের চেটোয় চেপে ধরে ঘাড়ে একটা তেরছা কান্নিক মারলে।

'মিথ্যে কথা লিখবেন কেন ?' ভূপেশবাবু আমতা-আমতা করতে লাগল: 'আমাকে আপনি চেনেন, আমি এই একটু ছ্যানো

ত্যানো—নেহাৎ কটা মামুলি ধরনের বিশেষণ—আর শেষকালে, নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছুই জানেন না—এই একটু সাফাই।'

'জানি না, কিছুই জানি না মশাই।' বই দিয়ে আঢাকা হাঁটুর উপরে জোরে বাড়ি মারল জিকি মিত্তির।

'যা জানেন না, তা জানি না লিখলে মিথ্যে কথা বলা হবে কি করে?'

'সংসারে কত জিনিসই তো জানি না, তাই ঢাক পিটিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে কবুল করতে হবে নাকি আমাকে?'

সত্যিই তো, এঁদের চাকরিটাই তো সব-জান্তা, ত্রিকালে ত্রিসংসারে এমন কিছু নেই যা এঁদের পাণ্ডিত্যের বাইরে।

কিন্তু তর্ক নিষ্ফল। তাই ভূপেশবাবু আবেকবার গলিতলোচন হলেন। বললেন, 'শুধু চরকা চালিয়ে সংসার চালানো যায় না। যদি দয়া করে লিখে দেন। একটা সার্টিফিকেট, জমিদারী সেরেস্তার চাকরিটা তবে পেয়ে যেতে পারি। আপনি একটু লিখলেই হয়ে যায়। সমস্ত জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আপনি—আপনি—একটু শুধু সামান্য পরোপকার—'

'বেয়ারা! বার করে দাও।'

তবু প্রশংসা করতে হয়, জিকি মিত্তিরের পদদ্বয় স্থানচ্যুত হয়নি। পদদ্বয় উচ্চে বলেই শরীরে রক্তচলাচল আনতে পেরেছে। নিচে নেমে পড়লে শেষ পর্যন্ত মাথার রক্ত কোথায় এসে পড়ত তার ঠিক্‌কি।

পদমদমস্তকে শেষবার প্রণাম করে বেরিয়ে এলেন ভূপেশবাবু।

সে কি। অন্ধকারে সেই ভূপেশ দত্তের মুখই কি এখন দেখছে না জিকি মিত্তির? হ্যাঁ, সেই ভূপেশ দত্তই তো? আগে যা দেখেছিল তার চেয়েও জীর্ণতর, দীনতর চেহারা। মুখে খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, একটা চোখে ছানি-পড়া, কানে বিড়ি গোঁজা। পরনে ধুতি, কিন্তু হাফ-প্যান্টের মতই সংক্ষিপ্ত, গায়ে দড়ি বাঁধা বেনিয়ান। কিন্তু হাতে ও কি, চরকা না সুদর্শন চক্র?

যেন হাত তুলে কী হুকুম করছে। এ শাসন-ত্রাসান ভঙ্গি। প্রভুত্বতপ্ত চক্ষু।

চোখ কচলাল জিকি মিস্তির।

সঙ্গে ও কে? সেই খাসমহলের প্রজা সুদাম সামন্ত না! ও তো মরে গিয়েছিল জলে ডুবে। ও তবে এল কি করে?

বুকের ভিতরটা ভয়ে ফাঁকা হয়ে গেল জিকি মিস্তিরের।

একটা পচা পানাপুকুরের জলে চুবিয়ে রাখা হয়েছিল সুদামকে। খাজনা না দেবে তো জল থেকে উঠতে দেবে না ইহকালে। দু-চারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল সুদাম, মাথার উপরে লাঠির বাড়ি মেরে জিকি মিস্তির নিজেই আবার তাকে তলায় পাঠিয়েছে। রাত দশটা হয়ে গেল, তবু চাষার খাজনা দেবার নাম নেই। চৌকিদার মোতায়েন রেখে বাড়ি ফিরল জিকি মিস্তির। রাত বারোটার সময় খবর এল, সুদাম এখনো খাজনা বের করছে না ট্যাঁক থেকে। এত শীত তবু হুঁশ নেই।

'ঠিক আছে। যখনই মাথা তুলবে তখনই লাঠির বাড়ি মারবি।' চরম উপদেশ দিয়ে লেপের তলায় শুতে গিয়েছিল জিকি মিস্তির।

ভোরবেলাই খবর এসেছিল বাকি-বকেয়া সব চুকিয়ে দিয়ে সুদাম চলে গিয়েছে ওপারে। রাত্রেই কাণ্ডটা ঘটে, কিন্তু সাহেবের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে বলে আর বিরক্ত করেনি কেউ। মরল কিসে? জিকি মিস্তির অবাক হবার অভিনয় করলে। সে-সব ঠিক আছে। মরেছে ডবল নিমোনিয়ায়। থানার বড় দারোগা হাসপাতালের বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাল।

সেই সুদাম সামন্ত আজ এখানে কি মনে করে?

'তোমাকে দেখতে এলাম। কেমন বুঝছ?' অন্ধকারে দাঁত বের করে হাসছে সুদাম। হাতের লাঠিতে ঠুকঠুক করছে।

হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ অন্ধকারকে দু'ভাগ করে দিল।

আশ্চর্য, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে।

'শিও সিং।' হাঁক দিয়েছিল জিকি মিস্তির। 'কাঁদে কে?'

আইন অমান্য করেছে যে সত্যাগ্রহীর দল তাদের মধ্যের একটা মেয়েলোক। জীবন সাঁতরার পরিবার মরণবালা।

'কাঁদে কেন?'

'বন্ধ হয়ে থাকবে না ঘরের মধ্যে। বলে, খুলে দাও কপাট।'

'ও, স্ত্রী-স্বাধীনতা বুঝি বেশি এদিকে? ঠিক আছে। দাও তো হাণ্টারটা।'

চাকরিতে প্রমোশন চাই। চাই শাসন-দক্ষতার প্রশংসা। আগুন স্ত্রী-পুরুষ বিচার করে না, আইন ভেঙেছ কি দগ্ধ হয়েছ নিঃসংশয়।

এ কি! এ যে সেই জীবন সাঁতরার পরিবার। পরনের শাড়িটার পাড় টকটকে লাল। কিংবা হয়তো উদ্গত রক্তধারাই তার শাড়ির ধার দিয়ে নেমে গেছে।

'বেয়ারা।' গর্জে উঠলেন ভূপেশবাবু।

এই যে তারই সেই শিও সিং। শুধু চাপরাশটা নতুন।

'বার করে দাও। ঘাড় ধরে বার করে দাও ঘর থেকে।'

ত্রস্ত চকিতের মত চারিদিকে চাইতে লাগল জিকি মিস্তির। ধারে কাছে কেউ নেই তার বন্ধু স্বজন। নিজের দেশে সে পরবাসী।

'ওঠো! ঘর ছাড়ো।' প্রবল শব্দে লাঠি ঠুকতে লাগল সুদাম।

চমকে উঠে পড়ল জিকি মিস্তির।

সামনেই রক্তবসনা মরণবালা। হাতেও কি তার চাবুক নাকি?

দরজার চৌকাঠের কাছে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল জিকি মিস্তির।

না, মরণবালার হাতে অস্ত্র নেই। সেদিনের সেই তীক্ষ্ণ আর্ত-নাদটাই যথেষ্ট চাবুক।

অন্ধকার ঘরে বসে স্বপ্ন দেখছিল জিকি মিস্তির। সুখস্বপ্ন নয় নিশ্চয়ই।

স্বপ্ন দেখছিল যত অতীত অকীর্তির।

এখন মনে মনে মেনে নিতে আপত্তি নেই, অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলত বোধহয়। কাঁদতে কাঁদতে যেমন শোক, খেতে খেতে যেমন খিদে, তেমনি মারতে মারতে হাতের আরাম।

তখন কে জানত হবে এমন অঘটন! শিবের অসাধ্য যে ব্যাধি, তাও একদিন সারবে!

মিসেস মিত্তির—বাঙলা নাম জুলি—বেড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন।

এ কি বাড়িঘর সব অন্ধকার কেন? শোকে পেয়েছে নাকি? বয়-বেয়ারারা সব কোথায় গেল? জিকি—জিকি—ঝিকিমিকি—

ড্রয়িং রুমে ঢুকে আলো জ্বালাল মিসেস মিত্তির।

ভূত দেখে চমকে উঠবার মত সে হটে গেল। ওকি, একা ঘরে আলো নিবিয়ে চুপ করে বসে আছ কেন? কি হয়েছে? খবর কি আজকের?

'খবর খুব খারাপ।' বুকজোড়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফার মধ্যে আরো ভেঙে পড়ল জিকি মিত্তির।

খারাপ? নিউজ হয়ে গিয়েছে?

হয়ে গিয়েছে। রেডিও বন্ধ। অন্ধকার।

'কি খারাপ?' মুখ চোখ ফ্যাকাশে করে জুলি একটু সামনে সরে এল। কি বলে ক্যাবিনেট মিশন?'

'স্বাধীনতা বুঝি এল!'

'এল?' ভয়াবিবর্ণ মুখে জুলি কিছুক্ষণ নিশ্চল থেকে ধুপ করে বসে পড়ল সামনের সোফায়। এক আঙুলের বদলে পাঁচ আঙুল গালে ঠেকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল: 'তা হলে কি হবে?'

একটা মহামারী আসছে, প্রতিষেধক ওষুধের ব্যবস্থা করো। বন্যা আসছে, বাঁধ বাঁধো। আগুন লেগেছে, জল ঢালো। কিন্তু স্বাধীনতার স্রোতকে তুমি ঠেকাবে কি করে?

কেউ ঠেকাতে পারবে না? কোনো ছল-চাতুরী কোনো কলা-কৌশল নেই?

যে যাই করুক, এবার একটা কিছু হবেই। আস্ত হোক আর কাটা হোক দেশ এবার আর স্বাধীন না হয়ে যায় না।

'তা হলে আমাদের কি হবে?' প্রবল জ্বরে প্রলাপে-পাওয়া রোগীর মত জুলি হাঁসফাঁস করতে লাগল।

অন্ধকার ঘরে বসে তারই স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষন। সেই সব সমাজের তলানিরা একজোট বেঁধে চীৎকার করে বলছে, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। যে মুখে ভয় ছিল সেখানে এখন সাহস, যে হাতে জরা ছিল সেখানে এখন শক্তি, যে কণ্ঠে কাকুতি ছিল সেখানে এখন হুকুম। সোজা হাত তুলে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে, বলছে—পথ দেখ।

'বাই জোভ, চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবে নাকি?' দু'হাতে বুক চেপে ধরল জুলি।

'তাই তো উচিত। দেশের প্রতি কোন মিত্রতাটা করেছি? চিরকাল ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি কি করে দেশের স্বাধীনতাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, দাবিয়ে রাখা যায়। ওদের স্বার্থে দেশের স্বার্থকে ছোট করেছি। ওদের সার্কাসে সং সেজেছি একেকজন। আমি—তুমি—আমাদের ছেলে-মেয়ে—

'দেশের কোনো উপকার করিনি বলতে চাও?' জুলি হাত-ব্যাগ থেকে পাউডার প্যাড বের করে মৃদু মৃদু চাপ দিয়ে দিয়ে চিবুকের ও কানের নিচেকার ঘাম মুছতে লাগল: 'এই যে এত চাঁদা তোলা, চ্যারিটি শো করা, হসপিট্যাল ডে করা, একজিবিশন খোলা, পার্টি দেয়া—এই সব একেবারে কিছুই নয়?'

'অত সুক্ষ্মভাবে হয়তো বুঝতে পারবে না। তুমি-আমি এত মোটা হয়েছি খেয়ে-খেয়ে হয়তো সবটা মোটা করেই দেখবে।' পাইপ ধরাবার জন্য পাউচ খুঁজতে লাগল জিকি মিত্তির, কি ভেবে নিবৃত্ত

হল পরমুহূর্ত। সংযত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'একটা মাত্র মেয়ে, সেও পর্যন্ত মোটা হচ্ছে মনের সুখে! লোকে দেখলে রাগ করবে না তো কি।'

'মাই গুডনেস। মিমিকে তুমি মোটা বলো? কে না জানে, ও একটু ফোলা, কিন্তু আসলে ওর ফিগারটি ভালো। ফর হেভেনস সেক, ওকে তুমি মোটা বলো না। একটু স্লিমিং একসারসাইজ করলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আর একসারসাইজের দরকার হবে না। লেহ্য পেয় না জুটলেই শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে যাবে দেখতে দেখতে।

সে না জানি কি বিভীষিকা। মেয়ে হলে মার হতেও আর বাকি থাকবে না।

ঝলসে উঠল জুলি: 'জুটবে না কেন লেহ্য পেয়? দেশ স্বাধীন হলে এই সব চাকরি আর থাকবে না বলতে চাও?'

'থাকবে হয়তো। কিন্তু আমরা থাকব না।' বড় নিঃস্বের মত ভাব করল জিকি।

'সে কি কথা? আমাদের দোষ কি? আমরা তো চাকর—বাহালি চাকর। যখন যেমন বলবে তখন তেমনি করব।' উত্তাল সমুদ্রে জুলি যেন একটা ভেলা ধরতে গেল: 'আগে সাহেব-মেম বানিয়েছে, এখন না হয় বোষ্টম-বোষ্টুমী বানাবে! আগে গড সেভ দি কিং গেয়েছি এখন না হয় রাম যাত্রার গান ধরব। আমাদের কি। লাইক মাস্টার লাইক সার্ভেণ্ট।'

'লাইক ডগ লাইক হ্যামারও হতে পাবে।'

'স্বাধীন দেশে হতে পারে না এ অবিচার। যদি সত্যি সত্যি গভর্ণমেণ্ট চালাতে হয়, তবে যারা জ্ঞানী-গুণী, যারা পাকা হাড়, হাতে পায়ে যাদের ঘাটা পড়ে গেছে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না।'

'কিন্তু আমাদেরকে যদি বা রাখে তাহলে মাইনে নির্ঘাত কমিয়ে দেবে।'

সেটা হতে পারে। সেটা জুলির কাছেও কেমন সঙ্গত মনে হল। দেশে যা আদর্শ তাতে বরদাস্ত করবে না এই মহার্ঘতা।

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিগগেস করল জুলি: 'কত কমাবে মনে হয়?'

'হয়তো আদ্ধেকেরও আদ্ধেক।'

'এত?' সেই যে জুলি চোখ টান করল তা আর শিগগির স্বাভাবিক হয় না।

'তার চেয়েও কম হতে পারে।'

'অসম্ভব।' গা-হাত-পা ছেড়ে দিল জুলি: 'এ হলে লোকে চালায় কি করে? গাড়ি নেই, রেডিও নেই, কার্পেট নেই, কুশন নেই, রেফ্রিজিরেটর নেই, এয়ার-কনডিশনার নেই—লোকে তাহলে কোন সুখে চাকরি করবে? ঐ মাইনে তো শুধু জুতোর কালি আর টুথ-পেস্ট কিনতেই চলে যাবে। গুড গড! ফেস-পাউডার আর নেল-পলিশ কিনব কি দিয়ে?'

'তোমার ভাবনা নেই। যারা ঘরেও নয় ঘাটেও নয় তাদেরকে ডাকবে না কেউ।'

'তাহলে কি হবে?'

'তাই ভাবছি।'

'তার চেয়ে চলো, ওদের সঙ্গে এসেছি, ওদের সঙ্গে ওদেশে চলে যাই। সোনার মুকুট ফেলে দিয়ে এদেশে গাধার টুপি পরে থাকব আর সবাই আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসবে এ অসহ্য।'

'অনেক অসহ্যই অনেকে এ পর্য্যন্ত সয়ে এসেছে। এতকাল বাদে আমরাও না হয় একটু আধটু সইলাম। গাছেরও খাব তলারও কুড়বো—এটা কি উচিত?'

এবার জুলির প্রায় কেঁদে ফেলবার যোগাড়। 'তার মানে তুমি বলছ স্বাধীনতা আসুক?'

'হ্যাঁ, আসুক। স্বাধীনতা মানেই প্রচুরতা। বাঁচবার প্রচুরতা। আলোর আর আনন্দের প্রচুরতা। আর, সকলের কিসে বেশি

আনন্দ, সত্যিকারের আনন্দ? খাদ্য আর বস্ত্র আর আরোগ্য আর আয়ু।'

'তুমি এ কথা বলছ? তোমার চাকরি যাবে, মান যাবে, প্রভুত্ব প্রতিপত্তি যাবে, তবু তোমার এ স্বাধীনতায় সায় আছে? গুড হেভেনস, তুমি পাগল হয়েছ নিশ্চয়ই।'

'হতে পারলুম কই!' জিকি মিত্তির অভ্যাসবশে আবার পাইপ ধরাতে গেল, আবার জোর করে নিবৃত্ত করলে নিজেকে। বললে, 'কিন্তু শুধু তোমার আমার জন্যেই তো বাঁচবার প্রয়োজন নয়, দীনাতিদীনের জন্যে। এই স্বাধীনতাই সেই দীনাতিদীনের আশা, তার স্বপ্ন। তার আনন্দের আশা, তার প্রচুরতার স্বপ্ন।'

'ডোণ্ট কোট স্ক্রিপচারস। প্লিজ। জুলি আবার ঝলস দিল: 'তার মানে আর সবাই ভাসবে-খেলবে আর আমরা শুধু তলিয়ে যাব?'

'তলিয়ে গেলেও, এত বড় দেশ, কোথাও না কোথাও ডাঙা পেয়ে যাব। ঢেউও খাব না জলেও ভাসাব না—তা কি হয়? পিঠে খাব আবার পকেটে পুরব তা কি সম্ভব? তাই, ভাবছ কেন, এক জায়গায় না এক জায়গায় পায়ে মাটি ঠেকবেই আর ঠিক দাঁড়িয়ে যাব। দেশ যদি মাথায় উঁচু হয় প্রসারেও বড় হবে।'

'তার মানে কোন কাজ করবে তুমি?' জুলি ওঠে পড়ল: 'এ যে ভূতের মুখে রামনাম।'

'আর চাকরি নয়। কিছু জমি কিনব। চাষবাস করব।'

'মাই গড! চাষা হবে?'

'মন্দ কি। তখন তো আর পাইপ খাওয়া চলবে না—ডাবা হুঁকোয় তামাক খাব।'

'আর আমি?'

'হাঁটু অবধি শাড়ি তুলে ঢেঁকিতে পাড় দেবে। তখন আর কক-টেইল পার্টি নেই, মাটির খুরিতে করে এক-আধটুকু ধেনো এক-আধ বেলা।'

'গো টু ব্লেইজেস। অমন স্বাধীনতা তোমার জাহান্নামে যাক।' জুলি ঝলমলে ঝাপটা মেরে চলে গেল, ভিতরে, মেয়ের কাছে, তার সমসুখভাগিনী সখীর কাছে। রূপচর্চায় দু'জনেই এত নিপুণ কারিকর যে কে মা আর কে মেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও সমঝে উঠতে পারে না।

দেখল মিমি একরাশ ফুল বুকের কাছে চেপে ধরে আদর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে সোফার মধ্যে।

'শুনছিস? সাড়ে দশটায় বি বি সি ধরতে হবে। এ দেশের খবরে বিশ্বাস নেই। ওদের খবর ওদের মুখ থেকেই শুনব। তুই বিশ্বাস করিস মিমু—এমন জমিদারী ওরা ছেড়ে যাবে? কিসের জন্যে যাবে, কোন দুঃখে? কি এমন ওদের অসুবিধা হচ্ছে? এমন বাপের কালের জমিদারী কেউ ছাড়ে?'

খুব ছোট ও গোল একটা হাই তুলে ও তাতে ডান হাতের আঙুলের ডগা কটি দিয়ে অতি আস্তে আস্তে কটি আলতো চড় মেরে মিমি সোজা হয়ে বসল। বলল, 'কি বললে? জমিদারের ছেলে? বিলেত ফেরৎ? তা হোক মা, তবু শুধু জমিদার শুনলে কেমন বমি-বমি করে।' একটু করুণ সুরে নাকে কাঁদল মিমি, 'কেমন থলথলে মোটা-মোটা মনে হয়। ইজ্ন্ট্ ইট?'

একই তাঁবুর বাসিন্দে মিসেস লিজি দত্তকে মিসেস জুলি মিত্তির চিঠি লিখছে:

ভাই লিজি, থাক, বিপদটা কেটে গেছে। সত্যনারায়ণের দোরে সিন্নি দিতে হয়নি। আমি জানতুম, আমাদের ছাড়া চলতেই পারে না স্বাধীনতা। এ তো অন্নপ্রাশন নয় এ দেশশাসন—আমাদের অভিজ্ঞতাব সুযোগ নিতে হবে কর্তাদের, যে খুশি কর্তা হোন, ভূপেশ কি ভূতেশ, কিন্তু কর্মের বেলায় আমরাই। আমরা ছাড়া আর কেউই বলতে পারে না কত ধানে কত চাল কত জলে কেমন হাল।

আমাদের কি! যেমন দেবতা তেমনি নৈবিদ্যি আমরা। প্রভু-ভক্তির পাঠশালায় আমরা প্রথম বেঞ্চির ছাত্র। আমাদের যেমন বলবে আমরা তেমনি শিখব। যদি কেউ বলে যেদিকে সূর্য ওঠে সেইটে পূর্ব দিক, আমরা তাই বলব। আর যদি কেউ বলে যে-দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড় সেইটি পূর্ব দিক, আমরা তাও বলতে রাজি আছি। আমরা তো দাঁড়ের ময়না। আমাদের যে বুলি শেখাবে সেই বুলি ধরব। গান্ধীকে ওরা 'সিডিশাস নেকেড ফকির' বলত, আমরা তার কি করব—এখন যদি বলো, ভারতের জনক, তবে তাই মেনে নেব মনেপ্রাণে। আমাদের কি! শিখিয়েছ, রুল ব্রিটানিয়া, তাই বলেছি। এখন যদি বল, ময়না, জয় হিন্দ কও, তবে, বেশ তো, জয় হিন্দই কইব।

আমি তাই জানতুম, আমাদের চাকরি যেতে পারে না, ইংরেজ সব ছেড়েছে কিন্তু আমাদের ছাড়েনি। আমাদের সেই প্রাক্তন পূর্ব-পুরুষদের প্রণাম, কি বলিস? যাবার আগে আমাদের সব পাকা গাঁথনির ঘরে মজবুত করে রেখে গেছে। শুধু তাই নয়, শুনছি আমাদের মাইনেও নাকি বেড়ে যাবে হুহুশ্বাসে, উল্কাগতিতে। হাতি ছিলি ঐরাবত হবি, কী মজা বল দিকিনি। এখানে, সেই স্বাধীনতার বেলায়ও, আমরাই সকলের মাথার উপরে। মাইনে বাড়বে না তো কি! আমাদের অভিজ্ঞতার দাম কি অল্প? হিংসুটে লোকের চোখ টাটাবে জানি, কিন্তু দেবতারা জানেন, আমাদের যোগ্যতা কি জিনিস!. কত দীর্ঘ সাধনায় তা অর্জন করতে হয়েছে।

এ পূর্বজন্মের পুণ্যফল, দেবতাদের আশীর্বাদ—এ আমরা কি করব? কেই বা কী করবে? আমাদের এ চাকরি যে স্বর্গের চাকরি তা কে না জানে! নইলে এত শস্তায় কি কিস্তিমাত হয়? শস্তা কেন বলছি? ভাব দিকি, এখন এস্টব্লিশমেণ্ট খরচ কত কমে যাবে আমাদের। সব তো এখন বাংলামতে চলবে? চায়না কাটলারি ছেড়ে এখন আবার সেই হাঁড়িকুঁড়ি সরা-মালসার যুগে যেতে হবে তো?

কার্পেট-কুশন ছেড়ে ঢালা ফরাসের যুগে? পেস্ট্রি পুডিং ছেড়ে মুড়ি-মুড়কির? এখন যত প্লেন হব ততই হাই হব। যতই আটপৌরে হব ততই পোশাকী দেখাবে। কি বলিস? আমরা তো আর এখন মিসেস নই, আমরা শ্রীমতী—আমাদের মূর্তিমানরা একেকটি শ্রীমান। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা আগাগোড়া মজার—তাই না?

শুধু মাইনেই বাড়ছে না, কে কোন জায়গায় গিয়ে বসবে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। দেখাদেখি তলাকার লোকগুলো পর্যন্ত গড়াগড়ি সুরু করে দিয়েছে, কে কাকে মুরুব্বি ধরে কোন ফাঁকে-ফোকরে এসে ঢুকতে পারবে। খাতির-খাতরার শ্রীক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে চার দিকে। একেই বলে জকিইং কর পজিশন। আমি আমার ওনাকে (বাঙলা মতে) এখন আর জিকি বলি না, জকি বলি। ঠিক বলি না বলতে চাস?

তোরা কোথায় গেলি? কদ্দুর উঠলি জানাস। যেদিকে জল পড়ে সেই দিকে ছাতা ধরলেই উন্নতি।

চিঠি লেখা শেষ হবার আগেই জিকি মিত্তির ঘরে ঢুকল।

এ কি অপরূপ পোশাক! পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, মাথায় গান্ধী টুপি। একেবারে আরেকটি নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। দিনের আলোয় না হলে জুলি হয়তো ভয় পেত। ভাবত সেই সেদিনের স্বদেশী গুণ্ডা বুঝি।

যেই গুণ্ডা সেই আবার বীর। যে সাহেব সেই আবার মোসাহেব।

'কেমন সেজেছি দেখ।'

'একেবারে শ্রীমানের মত।' জুলি বাঙালী মতে ফিক করে হাসল। বললে, 'ভাবছি, তিন পকেটে অত টাকা কি ধরবে?'

'তোমার অঞ্চল তো আছে। বাকি টাকা তোমার অঞ্চলে বেঁধে নেব।'

'যাই বলো, শস্তায় সারলে কিন্তু।' বাঙালী মতে জুলি একটু ঠেস দিলে: 'নতুন এক প্রস্থ স্যুট করতে হলে এ বাজারে হিমসিম খেতে—'

'শস্তা বলে নয়, এই এখন আমাদের আভিজাত্যের নিশানা।' বলে জিকি আলমারিতে ঝোলানো এক প্রস্থ স্যুট তুলে এনে নাটকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে এল জুলির কাছে। সুর করে বললে, 'এ বেশ-ভূষণ লহ সখি লহ,' তারপর একটা টাই তুলে নিয়ে, 'এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—'

'অফুল!' বাঙালী মতে হাতের ঝাপটা দিয়ে জুলি সরিয়ে দিল জিকিকে।

'দেখ, স্বাধীনতা হবার পর ও সব ইংরিজি আক্ষেপোক্তি আর চলবে না। তার চেয়ে 'দুগগা দুগগা', 'রাধেকৃষ্ণ', 'হরি হে পার করো'—এই সব শেখ। মেম হলে এখন আর প্রেম পাবে না, শেম পাবে।'

'বা, আস্তে আস্তে হবে। এক দিনেই কি আর আড় ভাঙে?'

'আর শোনো, কিছু রবীন্দ্রনাথের লাইন, গীতার শ্লোক আর তুলসীদাসের বয়েৎ মুখস্থ করো। ইংরেজি কথা একেবারে ডিসকার্ড করবে।'

'বই-টই তা হলে কিনে দাও। যা বলবে-করবে তাই বলব-করব।' বাঙালী মতে সঙ্গত সহধর্মিণীর মতই কথা বলল জুলি।

'আর দেখ, পোশাক-আশাকে মধ্যবিত্ত হয়ে যাও।'

'ভালোই তো। খরচও কমবে, নামও হবে।' মুচকে-মুচকে হাসল জুলি।

'আর কোথায় কে পরিত্যক্ত আত্মীয় স্বজন আছে তাদের খোঁজ নাও। তাদের বিয়ে-সাধে লোক-লৌকিকতা করো। আর মেয়েটাকে বলে দাও, বিলিতি মতে কোর্টসিপ-টোর্টসিপ করে খবরের কাগজে এনগেজমেণ্ট ছাপিয়ে বিয়ে করা চলবে না। এখন স্বদেশী হয়েছি,

দস্তুরমত শাস্ত্রমতে গণ-গোত্র মিলিয়ে বিয়ে দিতে হবে। আর দেখ, ড্যাডি-মামি যেন আর বলে না। তুমিও আমাকে আর জিকি বা জকি বলে ডেকো না। বলবে ওনা, উনি, কর্তা, ভদ্দরলোক, কিংবা খুব গম্ভীর করতে চাও তো গৃহাধিকারিক কিংবা কি জানি সেই দাঁত-ভাঙা কথাটা—"উপপ্রাদেশিকপরিবহনমহাধ্যক্ষ"—এমনি ধরনের একটা দোর্দণ্ড তিরস্কার। আমিও তোমাকে আর জুলি বা জুলু বা জু না ডেকে ডাকব, ওগো, হ্যাঁগো, বড়জোর গিন্নি বা কর্ত্রী, আর যদি খুব ভাব হয়, তবে "বাস্তুকর্মউপদর্শিকা"—বুঝলে?'

এমন সময় মিমি এল লাফাতে লাফাতে। বললে, 'লিপ-স্টিক-এর বাংলা কি হবে?'

'ওষ্ঠ-যষ্টি।'

'আর নেল-পলিশ?'

'নখ-প্রলেপ।'

'আর এই যে নেল পলিশ 'চিপ' করে 'ক্র্যাক্' করে 'পিল' করে তাকে বাংলায় কি বলব?'

জিকি মিত্তির এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে। বললে, 'তাকে বলবে আঁচড়ানো, কামড়ানো, মুখ ভ্যাংচানো।'

'দুগগা, দুগগা, সে আবার কি!' জুলি থ হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তাই।' জোর দিল জিকি মিত্তির: 'ওসব আর ব্যবহার করা চলবে না।'

'ও মাগো, সেকি কথা!' মিমি নাকের ভিতর দিয়ে সুর বের করল।

'হ্যাঁ, এখন দিশি মতে পান খাবে আর পায়ে আলতা দেবে। আর যদি হাত রাঙাতে যাও, তবে মেহেদি পাতার চাষ করো।'

'স্বাধীন হবার পর মেহেদি পাতা?'

'আর কায়স্থ মতে সম্প্রদান করে সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়ে। যাও, ওসব ছাড়ো, বাধ্য হোও। স্বাধীন হবার মানেই হচ্ছে বাধ্য হওয়া।'

ঘরের দেয়ালে মহাত্মা গান্ধীর ছবি ঝুলছে। ঘর নির্জন হলে তার খুব কাছে সরে এল জিকি। হাত জোড় করল। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল: 'সকল মতলববাজের মত আমিও তোমার টুপি পরেছি—আমাকে ক্ষমা করো। সন্ন্যাসীর ভেক ধরে সন্ন্যাসী হওয়া যায় কিনা জানিনা, কিন্তু তোমার এই পোশাক পরে যেন অন্তরে-বাহিরে পরিচ্ছন্ন হই।'

একটা অভিজাত ক্লাবে স্বাধীনতার বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন হচ্ছে।

কে একজন চোস্ত-শেরওয়ানি-পরা উপরতলার লোক বক্তৃতা দেবেন ক্লাবে। সেই উপলক্ষে বার্ষিক ডিনার হবে। সঙ্গে মদ। সেই উপলক্ষে মদের খরচ জোগাচ্ছেন গান্ধীটুপি-পরা ব্যবসায়ী। কোটিপতি।

নানান ধাঁচের মোটর এসে ভিড়েছে সামনের লনে, আনাচে কানাচে। ছুঁচলোমুখো, ঢেউতোলা, ডিঙ্গি-মারা। কোনোটা বা রাজহংসের মত পাখা ফোলানো। ফ্লাডলাইটের আলো পড়ে নানা রঙের ইলিবিলি চলেছে।

মেয়েরা এসেছে ঝাঁক বেঁধে, মরশুমি পাখির মত। একেকটি মত্ত রঙের প্রলাপ হয়ে। শাড়িতে-ব্লাউজে ঝলমলানি তুলে। দেখা না-দেখায়-মেশা বিদ্যুল্লতা হয়ে। মুখে-চোখে ঠাটে-বাটে একটা 'কাম্‌-হিদারিস্‌' ভাব ফুটিয়ে। গলে-ঢলে হেলে-বেঁকে। আস্কন্ধ অনাবৃত হাতে বিজ্ঞাপনের ছবি হয়ে। গ্ল্যামার-গার্ল হয়ে।

দু-একটি কৃষ্ণকলিও যে না আছেন তা নয়। তাঁরাও নখে-ওষ্ঠে রক্তবর্ণিনী হয়েছেন। মনে হচ্ছে কাঁচা মোষে কামড় দিয়ে সদ্য-সদ্য উঠে এসেছেন রক্ষাকালী। যাঁরা গতবয়স্কা তাঁরাও যত্ন করে সংশোধন করেছেন শরীরের ত্রুটি-বিচ্যুতি। একটু ছুকরি-ছুকরি ভাব এনেছেন।

দুঃস্থদুঃখত্রাতার দল এই ক্লাবের চাঁইরা। যারা মেম্বর তারা দু'তিন-জন করে গেস্ট আনতে পেরেছে। গেস্টরা বেশির ভাগই মেয়ে।

নতুন-চালু পরিভাষা অনুসারে সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা, মদোন্মাদা, পুলকাঙ্কুরসর্বাঙ্গা। আর ভদ্রলোকরা একেকজন মন্মথমর্দন মহাদেব।

স্বাধীন হবার পর নতুন দলে ভিড়ছে শ্রীযুক্তা পুষ্প সেন। বসেছে শ্রীযুক্তা জুলি মিত্তিরের পাশটিতে। শ্রীযুক্তা পুষ্পর মাংসে আপত্তি নেই, কিন্তু মদে হাত উঠছে না।

'ও কি, ওটা ছুঁচ্ছেন না কেন?' দীর্ঘ একটা চুমুক মেরে জুলি জিগগেস করলে।

'না, না, ওটা আমার পোষাবে না।' মুখের প্রান্তটা একটু বিকৃত করল পুষ্প।

'ইউ আর সো কনজারভেটিভ! স্বাধীন হবার পর—'একটা চোখের একটি কোণ জুলি একটুখানি কুঞ্চিত করল।'

'না না, তা কেন—' স্বাধীনতার পর রক্ষণশীলতাটা যে অত্যন্ত বাজে জিনিস তা বোঝবার বুদ্ধি হয়েছে পুষ্পর। তবু আমতা-আমতা করতে লাগল: 'কোনো দিন খাই নি কিনা।'

'তা খাওয়া একটু-আধটু শিখতে হবে তো?'

'খেয়ে নিন,' পাশের টেবিল থেকে বললে কে আরেকজন: 'কখন প্রহিবিশন হয়ে যায় ঠিক কি।'

'প্রহিবিশন হলেও এ ক্লাবে ঠিক পাওয়া যাবে।' আরেকজন টিপ্পনি কাটলে।

'ও! আপনার লিপস্টিকটা বুঝি খেলো—রংটা উঠে যাবে ভয় করছেন? তা বাইরের রং উঠলই বা—এখন তো ভিতরেই রং ধরবে। আচ্ছা,' চারদিকে তাকাল একবার জুলি: 'আজকের এজেণ্ডায় বল-ডান্স নেই? মাঝখানকার হিড়িকে বহুদিন বাদ পড়ে গিয়েছিল—দেখতুম স্টেপগুলো ঠিক আছে কি না—'

একটা মেয়ে নেচে-নেচে এ-চেয়ার থেকে ও-চেয়ারে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যিস, পুরুষের চেয়ারগুলোতে হাতল আছে। মেয়েটি খুঁজে-খুঁজে দেখছে কোন হাতলে গিয়ে বসবে। কোন হাতলটা মজবুত।

'ঐ বুঝি আপনার মেয়ে?' পাশের শ্রীযুক্তা মজুমদার জিগগেস করল।

'হ্যাঁ—'

'বেশ ব্লন্ড্ টাইপ তো? একটু মুটিয়েছে নাকি?'

'বাই জোভ, মোটা বলবেন না। একটু ফোলা, কিন্তু ফিগারটি ফাইন। তাই না? ডোণ্ট ইউ এগ্রি? মাঝখানকার হিড়িকে ক দিন ঠিক ডায়েটিংটা হয়নি ঠিকমত—'

'তা প্রচুর খাদ্যের সংগে প্রচুর স্বাস্থ্যও তো ভালো।'

'তা যাই বলুন, জলটা ওকে খেতে দিই না—' স্তিমিতচক্ষে নতুন গ্লাশ মুখে তুলল জুলি। সব ঠিক আছে। যেমনটি যেখানে ছিল তেমনটি সেখানে আছে। যে-কে-সে। আরো একটু গাঢ় হয়েছে রঙ। আরো একটু বুঁদ হয়েছে নেশা। আরো একটু উড়ুক্কু হয়েছে শ্রীমতীরা। কে মা কে মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না ঝাঁ করে।

সব ঠিক আছে। সেই তেলামাথায় তেল পড়েছে! টেকো মাথায় চাঁটি। ভুঁড়ির উপরে ষ্টেথিস্কোপ। সব ঠিক আছে। প্রধান অথিতি বক্তৃতা দিতে উঠলেন।

কত মহৎ কাজ করতে পারেন এই ক্লাবের মেম্বররা! কিন্তু যাদের জন্যে করবেন, সেই কমন-ম্যানরা কই আজকের এই ভোজ-সভায়? তাদের নিমন্ত্রণ করেন নি কেন?

এর উত্তর দেওয়া চাই! জিকি? জিকি মিত্তির? তুমি এ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট। যোগ্য উত্তর দাও।

ঠিক আছে। বলছি। দাঁড়াও।

খুব টেনেছে জিকি মিত্তির। টলছে। ঠিক দাঁড়াতে পাচ্ছে না।

'ঠিক আছে। ঠিক আছি। হে-হে-হে—' উঠে দাঁড়াল জিকি মিত্তির: 'দেখতে পাচ্ছেন না কেন স্যার, আমরাই তো আগামী কালের কমন-ম্যান।'

অনেক খুঁজে-পেতে বাড়ি বের করেছে। সে কি একটা গলির মধ্যে তেতলার ফ্ল্যাট। ঢুকতে যেমন মনে হয়েছিল উঠে এসে তত খারাপ লাগল না। বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি। এমনি একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পরিবেশই সুপ্রিয়কে মানাবে বুঝেছিল গুরুদাস।

তিন রুমের ফ্ল্যাট।

প্রথমে ঢুকেই বসবার ঘর। সুপ্রিয় আছ ?

চাকর এসে বললে, বাবু পুজোর ঘরে আছেন। বসুন।

দু'ঘণ্টার উপর বসে আছে গুরুদাস। উঠে যায়নি। বিরক্ত হয়নি। বই-পত্রিকা এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করছে। এক সময় চা ও জলখাবার দিয়ে গিয়েছিল চাকর, তাই খেয়েছে। সিগারেট পুড়িয়েছে গোটাকতক। এমনি বসতেই হবে দরকার হলে এমনি একটা সমর্পণের ভঙ্গি গুরুদাসের। কাজটা জরুরি।

চাকর এসে বললে, বাবু জিগেগস করলেন আপনার নাম কি ?

নাম বললে।

চাকর ফিরে এল। আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন।

ছোট একটা প্যাসেজ পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতে যেতেই সুপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠল, জুতো খুলে এস।

জুতো খুলল গুরুদাস। খোলাই উচিত। যার যেমন শুচিতার রুচি তার মান রাখা দরকার।

পাশের ঘরেই সুপ্রিয়র শোবার ঘর। শোবার ঘর না শুভ্রতার মন্দির। একটি যুগল-শয্যার খাট, সামনে একটা ডিভান। গোটা দুই গদিমোড়া টুল। একপাশে টেবিলের উপর সুপ্রিয়র স্ত্রীর একটি

বড় বাঁধানো ফোটো। একপাশে রুপোর সিঁদুরের কৌটো। ফোটোর ললাটে সিঁদুর পরানোর দাগ।

ওদিকের ঘরটা পুজোর ঘর। পুজোর ঘরই বটে। সবচেয়ে ভালো ঘর। পুব আর দক্ষিণ খোলা। ভালো ঘরটি নিজের শোবার জন্যে না রেখে দেবতার জন্যে রেখেছে এটা একটু অভিনব লাগল। তা সুপ্রিয়র অনেক কিছুই অভিনব।

পূজার ঘরের চারদিকের দেয়াল পটে-চিত্রে বোঝাই। মাঝখানে মেঝের উপর একটি কম্বল পাতা। আসনে দৃঢ়ীভূত হয়ে জপসাধনই আমার পূজা।

কী হয় এতে ?

আর কিছু নয়, সুখ হয়। বাঁধাবরাদ্দের উপর সকলেই একটু উপরি-পাওনা খোঁজে। সেই উপরি-পাওনার সুখ।

ঈশ্বরকে পাবার মানে কি ? কত লোকেই কত রকম প্রশ্ন করে। চাকরি পাওয়া বুঝি, বাড়ি পাওয়া বুঝি, বিষয় পাওয়া বুঝি—

ঠিক ঠিক। ও সব তো আছেই, তার উপরে এই একটু স্বর পাওয়া, স্পর্শ পাওয়া। সেই মা আছেন অনেক ছেলের সংসারে, অন্নজল পরিবেশন করছেন সবাইকে, কে আর মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করে সচেতন ? এরই মধ্যে এক ছেলে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, মার মুখের কথা শুনল। একটু অতিরিক্ত কিছু আদায় করে নিল। সেই অতিরিক্তটুকুই ঈশ্বর।

কিন্তু যখন অন্নজল নেই ?

ঈশ্বরও নেই।

গুরুদাস এ সব তার্কিকের দলে নয়; সন্দেহ করে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাও করে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে সুপ্রিয় তার বন্ধু, আলাদা বিভাগে হলেও একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, উঁচু ধাপের অফিসর সুপ্রিয়—এবং সর্বোপরি, আজকে তো তর্কের কথা উঠতেই পারে না।

কি খবর ? বিশুদ্ধ চিন্তায় মনে যে লাবণ্য আসে সেইটিই কান্তি হয়ে ফুটেছে সুপ্রিয়র দেহে-মুখে।

তুমি ক্ষণু, ক্ষণিকাকে চেন ?

কে ক্ষণিকা ?

আমার ভাগ্নী—

চোখ বুজল সুপ্রিয়। চিনতে পারল। সেই যার ডাকনাম টেঁপী।

হ্যাঁ, তার খবর শুনেছ ?

না।

তার স্বামীটি মারা গেছে।

কদ্দিন ?

এই বছর খানেক।

কিসে ?

য়্যাকসিডেণ্টে—

কি জাতীয় দুর্ঘটনা বিশদ করে বলতে চাইছিল গুরুদাস, সুপ্রিয় বাধা দিল। বললে, বুঝেছি। অপঘাত।

তুমি তার স্পিরিট—আত্মা আনতে পারো ?

আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

ভীষণ দমে গেল গুরুদাস। গলার স্বর বেরুল কি বেরুল না : কেন ?

প্রেতলোকের বাসিন্দেরা বারে বারে একটা খবরই দিয়ে গেছে, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে ডাকো তাঁকে ধরো। আমাদের ডেকে আমাদের ধরে লাভ নেই।

সে খবরের জন্যে প্রেতলোকে যেতে হবে কেন ?

না, ওরা বলে, আমরা রাজধানীর কাছাকাছি আছি, তোমরা আছ অজ পাড়াগাঁয়ে। আমাদের থেকে খবর নাও, লাটসাহেব আছেন। আমরাই নির্ভরযোগ্য খবর দিতে পারি। আমাদের কেউ কেউ দেখেছে তাঁর মোটরগাড়ি তাঁর পাইকপেয়াদা। এই খবর পেয়ে

এখন ওদিকে এগোও। তাই এখন সেই চেষ্টাই করছি। কিভাবে চেষ্টা করতে হবে তারও কিছু কিছু পাঠমালা পৌঁছে দিয়েছে দয়া করে—তা ছাড়া—

তা ছাড়া—কান খাড়া করল গুরুদাস।

তা ছাড়া, যাকে ধরবার জন্যে এই প্রেতচর্চা, তিনিই কখন-সখন দেখা দেন মূর্তি ধরে।

দেখা দেন? প্রায় লাফিয়ে উঠল গুরুদাস। কে, তোমার স্ত্রী?

হ্যাঁ। শাশ্বতী।

কদ্দিন মারা গেছেন?

দেহ রেখেছেন। এই দু'বছর।

দেখা দেন, কথা হয় তাঁর সঙ্গে?

কথা হয় বৈকি। শুধু ছুঁতে দেন না। ছুঁতে চাইলেই নিষেধ করেন। কতদিন সিঁদুর দিতে গিয়েছি, সরে গিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে এগোতে গেলেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

কে জানে কাব্যকথা হয়তো। তবু দিনের বেলায়ই কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল গুরুদাসের। বললে, তুমি অনেক উঁচুয় উঠে গিয়েছ। কিন্তু মেয়েটার প্রতি যদি একটু কৃপা করো।

খুব কান্নাকাটি করছে? খুব কান্নাকাটি করলে আসতে চাইবে না আত্মা।

না, এতদিনে সে ঝড়ের অবস্থাটা গেছে। তবু শোকের তো আর শেষ নেই। শেষ সময়ে কাছে ছিল না, একটা কথা বলে যেতে পারল না, শুনে যেতে পারল না—তারই জন্যে একটু আনতে চায় শুনতে চায়। যদি একটু সান্ত্বনা দিতে পারো—পরোপকার—

এই স্পিরিট আনার ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ঠিক রেডিওর কাণ্ড। এক পারে একটা ট্র্যানসমিটিং স্টেশন, আরেক পারে একটা রিসিভিং সেট। একটা পাঠাবার যন্ত্র, আরেকটা ধরবার।

ছুটোই নিখুঁত হওয়া চাই। যে আসবে তারও চাই ব্যাকুলতা আর যে আনবে তারও চাই তেমনি সুরবাঁধা দেহ। এপারের দেহ যদি শুধু কাঠ হয় ধ্বনি শোনা যাবে না, তেমনি ওপারের বিদেহ যদি উৎসুক না হন তা হলে অবস্থা হবে বাজনা আছে বাজিয়ে নেই। সুতরাং দুয়ের যোগ হলেই শুভযোগ। যদি কোথাও দেখ ফল হয়নি, জানবে যন্ত্রের গোলমাল। যন্ত্র যত জোরালো ততই নির্ভুল সাড়াশব্দ।

তা হলে তুমি একদিন বসো।

আমি বসলে হবে কেন? ক্ষণিকার স্বামী কি আমাকে চেনে? আমার কাছে আসতে তার আগ্রহ হবে কেন? ক্ষণিকাকে বসতে হবে।

বা, ক্ষণু তো বসবেই। কখন বসতে হবে বলো, কবে?

প্রথম একবার বসলেই কি পাওয়া যাবে? তার জন্যে আগে একটু কাঠখড় পোড়ানো চাই।

যথা?

একজন গাইড ধরতে হয়। আমাদের বৈঠকে পরিচিত এমন কেউ। সে আগে খুঁজে বের করবে কোন ঠিকানায় রয়েছে ক্ষণিকার স্বামী। কি নাম বললে?

শমীন্দ্রনাথ—

ওতেই হবে। খুঁজে পেলে তারিখ ও সময় ঠিক করে যাবে কখন তাকে আনতে পারবে পৃথিবীতে। সেই অনুসারে বসলে পাওয়া যাবে শমীন্দ্রকে। নচেৎ নয়।

এমন গাইড হবে কে?

ফ্রেণ্ডলি গাইড চাই। সে আমার স্ত্রীকে বলা যাবে'খন। সে আনতে পারবে খুঁজেপেতে। তুমি আগে শমীন্দ্রের বিবরণগুলো আমাকে দিয়ে যাবে। কবে কোথায় জন্ম, কবে কোথায় মৃত্যু, বাপ-ঠাকুরদার নাম কি, বাড়ি কোথায়, কি কাজ করত, কত বয়স, যতদূর

যা সম্ভব। এসব একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে বলে দেব। তিনি খুঁজে দেখবেন। কখনো-কখনো বের করতে দেরি হয় কখনো বা পাওয়াই যায় না, আবার কখনো বা চট করে পেয়ে যায় হাতের কাছে। খুঁজে পেলে তিনি জানাবেন কবে কখন বসতে হবে।

যে সব বিবরণ দরকার আমি এখুনি ।দয়ে যাচ্ছি।

লিখে দাও। সম্ভব হলে শমীন্দ্রের একটা ফোটোও দিয়ে যেও। লোকটিকে দেখে যেতে পারলে আমার স্ত্রীর পক্ষে সুবিধে হবে।

তারপর দিনক্ষণ ঠিক হলে কি করতে হবে?

হ্যাঁ, আগে থেকেই বলে রাখি, একটি ঠাকুরঘর চাই বাড়িতে। আছে?

তা কোন না আছে?

নিশ্চয়ই নিচের তলার কোণের ঘরটিতে, সিঁড়ির নিচে, তাই না? হাসল সুপ্রিয়। যে তলাতেই থাক সে তলাতেই বসতে হবে।

আবার পূজার ঘর লাগবে কেন?

বলা মুশকিল। কোথাও একটু শুচিতার পরিবেশ চায় হয়তো।

আর?

সেদিন বলে দেব। বিশেষ হ্যাঙ্গাম নেই। এস কদিন পর।

কদিন পরে খোঁজ নিতে এল গুরুদাস।

সব ঠিক আছে। শাশ্বতী দেখা পেয়েছে শমীন্দ্রের। আগামী বুধবার রাত নটার সময় আসবে।

আসবে?

তাইতো বলে গিয়েছে। ঘোরাঘুরি করতে হয়নি নাকি, সহজেই পেয়ে গেছে।

সত্যি? পাওয়া গেছে? ক্ষণিকার উৎসাহেরই যেন প্রতিধ্বনি করল গুরুদাস।

বসলেই বোঝা যাবে কতদূর কি হয়।

এখন কি করে বসতে হবে বলো।

কিছু নয়। একটা টেবিল যোগাড় করো। চারপেয়ে টেবিলেই চলবে। যে কোনো সাইজের যে কোনো ওজনের। বেশি বড় ও ভারি টেবিল নিলে বেশি শক্তিশালী রিসিভিং সেট দরকার। ওপারেও চাই বেশি স্পিরিটের জনতা। নইলে নড়বে কি করে? আর, না নড়লে স্থূলজ্ঞানে প্রমাণ হবে কি করে যে তারা এসেছে? সুতরাং ছোট দেখেই টেবিল নিও। কিছু ধূপকাঠি, গঙ্গাজল, লেখবার কাগজ, পেন্সিল—এই আর কি।

শুধু এই?

হ্যাঁ, দেখো রাষ্ট্র করে যেন বেশি লোক জমায়েৎ কোরো না। কৌতূহলীকে প্রেতাত্মারা ভীষণ অপছন্দ করে, ভালোবাসে বিশ্বাসীদের। কৌতূহলীর ভিড়ে আসতে চায় না, বিশ্বাসীর দলে আরাম পায়। এ ঠিক আমার-তোমার মনোভাব। সেই আড্ডায় আমরা যেতে চাইনা যেখানে আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে। সেই আ.ড্ডায়ই আমরা যেতে চাই যেখানে আমরা সুস্বাগত। কোথায় বসবে?

ক্ষণু এখন বাপের বাড়িতে আছে সেইখানে। কিন্তু কে কে বসবে?

ক্ষণিকা আমি তুমি ও আরেকজন।

ওরে বাবা, আমি পারব না।

কেন, ভয় কি। নিজের হাতে দেখই না অনুভব করে ব্যাপার কি।

আচ্ছা, শুনতে পাই সবই নাকি অবচেতন মনের কাণ্ড?

বেশ তো, দেখই না পরীক্ষা করে। কতটুকু অবচেতন মন কতটুকুই বা অলৌকিক। কতটুকু বিজ্ঞান, কতটুকুই বা অবিজ্ঞেয়। তা ছাড়া মনের মত অলৌকিক আর কি আছে, তারই বা একটু হদিস নাও।

আর কিছু নির্দেশ আছে ?

হ্যাঁ, তোমার ভাগ্নীকে বলবে সেদিন যেন উপোস করে থাকে। ঠিক নির্জলা নয় একটু লঘু আহার।

তা আর বলতে হবে না।

আর যেন খানিকক্ষণ হরিনাম করে। যতক্ষণ সম্ভব। বা যতক্ষণ ইচ্ছে।

আবার হরিনাম কেন ?

এই একটা কিছু অনুরাগের ধ্বনি। ঈথরে একটু অনুকূল কম্পন। ভালো বেহালা বা বাঁশি বা শঙ্খধ্বনি করলেও হতে পারে। কিন্তু বলো তেমন করে ডাকতে পারলে হরিনামের মত প্রিয়নাম আর কি আছে ?

বেশ, বলব।

এই শরীরটাকে একটু সুরে বেঁধে নেওয়া আর কি। একটা সূক্ষ্ম সুর ধরবে একটু তৈরি করে নেবে না যন্ত্রটাকে ?

বরাদ্দ দিনে সুপ্রিয় গিয়ে দেখল আটদশজনের ভিড়। সবাই বললে, আমরা বিশ্বাসী, সশ্রদ্ধ, কেউই কৌতূহলী নই।

চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না। কিন্তু সবাই কনিষ্ঠ আত্মীয়, কাকে ছেড়ে কাকে বারণ করবে। বসুক দূরে-দূরে, দেখুক, বুঝুক—

সমস্ত কিছুকে আড়াল করেছে ক্ষণিকা নিজে। এককথায় বলা যেতে পারে, শোকশ্রী। দুঃখ একটা আশ্চর্য শক্তি। আয়ত চোখে নিস্পৃহ স্নেহ, মুখমণ্ডলে অসঙ্কোচ ভক্তি। সমস্ত ভঙ্গিটিতে বিশ্বাসের নম্রতা। একেবারে যে নিরম্বু বিধবার সাজ পরে নি তাতে শান্তি পেল সুপ্রিয়। হাতে সোনার চুড়ি, ধোপভাঙা শাড়ির পাড়টি ঢালা সবুজ। ঠিকই করেছে। মৃত্যু বলে কিছু নেই। এ ঘর আর ও ঘর। এখুনি প্রমাণ পাওয়া যাবে হয়তো।

বেশ বড় ঘর। জানলা-দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। পুড়ছে ধূপকাঠি। চারপেয়ে টেবিল পড়েছে মাঝখানে। চারদিকে

চারখানা চেয়ার। কাছে একটা টুলের উপর কাগজ-পেন্সিল। গুরুদাসকে জোর করে রাজি করানো হয়েছে, যদিও সে বলতে চেয়েছিল উপোস-টুপোস খাতে সয়না আর হরিনামের বানান শিখিনি এ পর্যন্ত।

আর চতুর্থ, ক্ষণিকার ছোট ভাই বিজন।

সুপ্রিয় বললে, আমাদের দুজনের উপোসেই হবে, আমার আর ক্ষণিকার। তোমরা শুধু পাশে বসে একটু হাত রাখো টেবিলে। অর্কেস্ট্রার হালকা বাজনা তোমাদের দিচ্ছি। পাশের ঘরে বা প্যাসেজে যারা বসেছে তাদের উদ্দেশ করে বললে, চুপচাপ থাকুন। আর যদি ভয় পাবার কারণ ঘটে দয়া করে ভয় পাবেন না।

লঘু উপেক্ষায় হাসল একটু সকলে।

গুরুদাস বললে, টেবিলের উপর হাত রেখে শমীনের কথা চিন্তা করতে হবে তো?

মোটেই না। নেমন্তন্নের কার্ড আগেই পাঠানো হয়েছে। তারা তৈরি। এখন গাড়ি পাঠালেই হয়।

গাড়ি?

হ্যাঁ, ধ্বনির গাড়ি, ধ্বনির গাড়ি পৌঁছুলেই রওনা হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, ক্ষণিকাকে লক্ষ্য করল, যদি আসে কাঁদতে পাবে না।

না।

কান্না বলে কিছু নেই। অনন্ত জীবন, অনন্ত যাত্রা।

আর দেরি করে লাভ কি? ব্যস্ত হয়েছে ক্ষণিকা। আলোটা নিভিয়ে দেব?

বড় ভালো লাগল। বুজরুকি কিছু আছে আলো জ্বালা থাকলেও লোকে ভাববে। তবু ঘর অন্ধকার করবে না বলেই ঠিক করেছিল সুপ্রিয়। ক্ষণিকার এই প্রশ্নে সাহস পেল। যেন মমতার গভীর স্পর্শ বেজে উঠল কণ্ঠস্বরে। যেন যারা আসবে তারাই বলল।

প্রথমটা বেশি আলো ভালো লাগে না। বহুদিন পরে নতুন পরিচয় একটি ধূসরতাই আশা করে হয়তো।

দাও। তার আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও সকলের গায়ে।

এ আবার কেন ? বলে উঠল গুরুদাস।

সংস্কার। বাতাসের সঙ্গে গন্ধ যায় তেমনি আত্মার সঙ্গে সংস্কার।

আলো নিভিয়ে দিল। এপাশে ওপাশে দু-একটা না-জ্বললে-নয় আলো জ্বলছে বাইরে। তবু যারা জমায়েৎ হয়েছিল জলের ছিটায় কেমন একটু শিউরে উঠল। থমথমে হয়ে উঠল বাড়ির ভিতরটা। বোমা-পড়ো-পড়ো কলকাতার আকাশের মত।

টেবিলের উপর আলগোছে হাত রেখে বোস। যদি মন শূন্য করতে না পারো সমুদ্র ভাবো—

গাড়ি ছাড়ল সুপ্রিয়। অর্থাৎ দরাজ গলায় নামকীর্তন শুরু করল।

সভ্য সমাজে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না রেখে কেউ গলা ছেড়ে নাম করতে পাবে এ একেবারে ভাবনার বাইরে। একটা বিলিতি অফিসে সাহেব সেজে কাজ করে তার এ কি দুর্গতি। ভাবতে না ভাবতেই কাজ হল। হাতের নিচে টেবিলটা নড়ে উঠল। শুধু নড়ে উঠলনা, খরখর করে হাঁটতে লাগল ঘুরতে লাগল, দুলতে লাগল নৌকোর মত। গুরুদাসের মনে হল পা তুলে তার কোলের উপরেই উঠে আসে বুঝি!

ভূত, ভূত—লাফিয়ে উঠে আলো জ্বেলে দিল গুরুদাস।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হল টেবিল। কিন্তু আবার গুরুদাস স্থির হয়ে বসে টেবিলে হাত রাখতেই টেবিল ফের নড়া শুরু করলে।

আলো থাক। বললে সুপ্রিয়। আলো বরং ভালোই করবে। বলে আবার হরিনামের ঢেউ তুললে।

তাকাল একবার ক্ষণিকার মুখের দিকে। চোখদুটি বোজা, মুখ যেন পাষাণ। যেন কোন গভীরের প্রতিলিপি!

যেমন ছন্দে নাম করে তেমনি ছন্দে টেবিল নড়ে। টেনে-টেনে বললে বিলম্বিত, তাড়াতাড়ি বললে দ্রুত তাল।

সাবকনসাস মাইণ্ড—চেঁচিয়ে উঠল গুরুদাস।

অমনি হাত তুলে নিল সুপ্রিয়। যে-মন রয়েছে আঙুলের আগায় সে-মনকে সরিয়ে নিল। আর হাত তুলে নিতেই টেবিল হাঁটতে লাগল নিজের থেকে, এঁকে-বেঁকে ঘুরতে-ঘুরতে এগুতে লাগল প্যাসেজের দিকে।

প্যাসেজের লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল। কিন্তু কথা রেখেছে, চেয়ার সরানোরই যা শব্দ করেছে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ করেনি। অজ্ঞান হয়ে পড়েনি।

কতদূর গিয়ে থেমে পড়েছে টেবিল। সুপ্রিয় উঠে গিয়ে তাতে আবার হাত রেখে নামের সঞ্চার করে দিল। আবার টেবিল শুরু করল চলতে।

ওদিকে যাচ্ছে কেন ?

জিগগেস করো তো ওদিকেই ঠাকুরঘর কিনা।

ঠিক। প্যাসেজের পারেই ঠাকুরঘর। কি আশ্চর্য, কে সেটিকে বন্ধ করে রেখেছে বাইরে থেকে তালা দিয়ে। টেবিল নিজে থেকে দরজায় ধাক্কা মারছে। একবার দুবার—শিগগির খুলে দাও দরজা।

দরজা খুলে দিল। আবার তাকে ছুঁয়ে দিল সুপ্রিয়। টেবিল ছুটে উঠল গিয়ে সিংহাসনে। বাসনকোসন সব তছনছ করে দিল। প্রণামের ভঙ্গিতে পড়ল নত হয়ে।

দু'বাহুর মধ্যে করে টেবিলকে তুলে নিয়ে এল আগের ঘরে। সুপ্রিয় বললে, ঠাকুর-প্রণাম হয়েছে, এখন শান্ত হও।

ডাক্তার, ডাক্তার—কে কোথায় শান্ত হবে! কে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। জল, জল, পাখা—

আবার আসন ছাড়ল সুপ্রিয়। কাছে গিয়ে বললে, কোনো ভয় নেই। ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি।

এ অবস্থায় কি করতে হবে, তা আমাকে শেখানো আছে। কেন যে সব ভিড় করতে আসে! বলে, বিশ্বাসী! বিশ্বাসী কখনো অজ্ঞান হয়? বলে সংজ্ঞাহীনের কানে কি মন্ত্র পড়ল সুপ্রিয়। মুহূর্তমধ্যে লোকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। বললে, না, কিছু না।

আবার এসে বসল চেয়ারে। বললে, আর জ্বালিয়ো না, এবার ছুটো মনের কথা খুলে বলো। কাকে দিয়ে লেখাবে? আমি এক, গুরুদাস দুই, বিজন তিন, ক্ষণিকা চার। টেবিলে শব্দ করে জানাও।

ঠক ঠক ঠক ঠক।

পর পর চারবার টেবিলটা নিজের থেকে বেঁকে গিয়ে পায়া ঠুকে শব্দ করলে।

এতটুকু ঘাবড়াল না ক্ষণিকা। কাগজ-পেন্সিল কুড়িয়ে নিল হাত বাড়িয়ে।

নিজের থেকে কিছু লিখো না। কেউ হাত ঘুরিয়ে লেখাতে চাইলেও বাধা দিও না।

তুমি কে? জিগগেস করলে ক্ষণিকা।

ক্ষণিকার হাতে লেখা হল: আমি।

আমি কে?

ক্ষণিকা আবার লিখলে: ও, গলার আওয়াজ তো তুমি শুনতে পাচ্ছ না। আমি—ইংরিজি-বাঙলায় বড় বড় হরফে ক্ষণিকা লিখলে: শমীন্দ্রনাথ—

তুমি যে সত্যি সেই, তা কি করে বুঝব?

নিজের হাতে লিখে যাচ্ছে ক্ষণিকা: আমার ম্যারেজ য়্যাণ্ড মর‍্যালস বইয়ের ফাঁকে দশ টাকার তিনখানা নোট গোঁজা আছে। দেখ, পাবে।

সে বই তো তোমাদের বাড়িতে। কি করে দেখব?

না। সে বই তুমি তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ পড়বার জন্যে। তোমার বাক্সেই সেটা আছে। দেখ খুলে।

বাক্স খোলা হল। পাওয়া গেল বই। বইয়ের পৃষ্ঠার ভাঁজে তিরিশ-তিরিশটা টাকা।

আরো অনেক সব প্রমাণ। চশমার খাপে সোনার বোতাম পড়ে আছে দেখ। ফাউন্টেন পেনের কালির বাক্সের মধ্যে ডাইং-ক্লিনিংএর রসিদ। কার কাছে কটা টাকা পাবে। কোন ব্যাঙ্কে পড়ে আছে কিছু তলানি। অনেক সব অন্তরঙ্গ কথা। কেমন আছে? কোথায় আছে? ওটা কোনো রকম থাকা নাকি? কি করে? কি ভাবে? কেন চলে গেল অকালে?

আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।

টেবিলটা নিজের থেকে লাফিয়ে উঠল দুবার। লেখা বেরুল ক্ষণিকার হাতেঃ এই দুর্লভ জীবন স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে নষ্ট কোরো না। জীবনে-যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মত বয়ে যাও হু হু করে।

বেশ বলেছ। মুখে বলল ক্ষণিকা। কোথায় আমার শান্তি? আমার আশ্রয়!

স্পষ্ট লিখছে ক্ষণিকা নিজের হাতেঃ যে মহদাশয় এসেছেন তোমার ঘরে তাঁকে ধরো, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নাও, নাম নাও, মন্ত্র নাও—সেইখানেই তোমার পরা-গতি, পরা-সিদ্ধি—

পেন্সিলটা থামাল জোর করে। বললে, আমাকে দেখা দিতে পারো?

লেখা হলঃ পারি।

পারো?

হ্যাঁ, তবে এ বাড়িতে নয়।

কোথায়?

সুপ্রিয়বাবুর বাড়িতে। সেখানে প্রেতাত্মারা আসে। তাঁর স্ত্রী আসেন। পুণ্যস্থান। সেখানে দেখা দেওয়াই সহজ। দিন-ক্ষণ আমি বলে দেব স্বপ্নে—

ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্ষণিকা। বললে, না, না, এখানে এ বাড়িতে দেখা দেবে। আমার নির্জন ঘরে। নয়তো ছাদের উপর। মধ্যরাত্রে, শেষরাতে। স্বপ্নে নয়, স্বপ্নে দেখে শান্তি নেই। বাস্তব চোখে দেখতে চাই, ধরতে চাই—

হঠাৎ লেখা পড়ল ঃ আমরা এবার যাব। মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

আর কারু কথা। সুপ্রিয় বললে, শাশ্বতীর।

এবার ছেড়ে দিন। পড়ল শেষ লেখা।

হাত ছেড়ে দিল। পুরো কথাটা শেষ হতে পারল না।

হাত তুলে নিতেই টেবিল আবার ছুটল ঠাকুরঘরের দিকে। ঠাকুর-প্রণাম করে যাবে। এবার ঘর খোলা, লোকজনের মন বিগলিত, সহজেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারল ভিতরে। নুয়ে পড়ে প্রণাম করল টেবিল।

গুরুদাস বললে, অপরিমেয় ব্যাপার।

ডিভানে বসে আছে শাশ্বতী।

আমি জানি আজ রাতে তুমি আসবে। দেখা দেবে। স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে কাল। পূজার ঘর থেকে মাতালের মত বেরিয়ে এল সুপ্রিয়। গভীর ধ্যানের পর দেহে-মনে অপার্থিব মাদকতা আসে, পা টলে। দেয়াল ধরে ধরে এগুতে হয়।

ঘরে মৃদু নীল আলোটি জ্বলছে। চাঁদের আলোও মিশে গেছে নীল হয়ে।

এস, আজ দিনটি তো জানো, তোমাকে পরিয়ে দি সিঁদুর।

আর আর দিন নড়ে-চড়ে ওঠে। আজ স্থির হয়ে বসে রইল। ছোঁয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়, আজ যেন ছায়ারই প্রাণ নেই।

রূপোর কৌটো খুলে আঙুলে করে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল কপালে।

এ কি, স্পষ্ট ছোঁয়া যায় যে। কঠিন মাংসল কপাল। স্পষ্ট চুল, স্পষ্ট সিঁথি।

তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে ঝাঁজালো আলোটা জ্বালাল সুপ্রিয়।

চেঁচিয়ে উঠল নারীমূর্তি : এ কি, স্বপ্ন তো আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তো শাশ্বতী নই, আমি ক্ষণিকা।

কেন এ রকম হল কে জানে! আচ্ছন্নের মত বলল সুপ্রিয়, তবে, চিরকালই, আজ যা ক্ষণিকা, কাল তা শাশ্বতী।